Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: তানজিলা আক্তার ইমা

রোলঃ 23100121698

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: তানজিলা আক্তার ইমা

রোলঃ 23100121698

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: তানজিলা আক্তার ইমা, আইডিঃ 23100121698 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তানজিলা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছা: তানজিলা আক্তার ইমা

আইডিঃ 23100121698

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

প্রথম অধ্যায় 7

নারীকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন? 7

দ্বিতীয় অধ্যায় 21

ইসলামে নারীর অধিকার 21

তৃতীয় অধ্যায় 44

নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়েজনীয়তাঃ 44

চতুর্থ অধ্যায় 51

বহুবিবাহ ও ইসলাম 51

পঞ্চম অধ্যায় 59

তালাক প্রসঙ্গ 59

ষষ্ঠ অধ্যায় 65

নারীর রাজনৈতিক অধিকার 65

সপ্তম অধ্যায় 72

নারী স্বাধীনতার ধুয়া 72

অষ্টম অধ্যায় 97

সুপার উইমেন 97

নবম অধ্যায় 103

কেমন আছে মুসলিম নারী 103

উপসংহার 114

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

"সীমাহীন প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যার মেহেরবানীতে যাবতীয় মহৎকর্ম সুসম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর রসূল মুহাম্মদ(স:)এর প্রতি যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে- তাঁদের প্রত্যেকের ওপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত, শান্তির অফুরন্ত ধারা।"

নারী। জগতের সৌন্দর্য। সৃষ্টির অপার বিস্ময়। আল্লাহ তাকে দান করেছেন মমতা ও ভালোবাসার অসামান্য এক শক্তি। যে শক্তি দিয়ে সে বিরাজ করে জগতের প্রতিটি পুরুষের জীবনে। নারীহীন পুরুষের জীবন যেন মৃত্যুপুরী। নারীহীন জগৎ যেন নিস্তব্ধ গোরস্তান। মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার অধিকারী। তিনি নারীর মাধ্যমে তার সৃষ্টিকে পূর্ণতা দান করেছেন। নারীকে তিনি সৃষ্টির অপরিহার্য অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী প্রতিটি মানুষই ব্যাপারটি স্বীকার করে। তাই স্বভাবতই উভয়ের ভূমিকা, কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বে ভিন্নতা থাকবে-এটাই যৌক্তিক।

ইসলাম ইনসাফের ধর্ম। ইনসাফ মানে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচার। প্রত্যেকের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার দায়িত্ব ও অধিকার বণ্টন। আর নির্ভুলভাবে তা সম্ভব একমাত্র সেই সত্তার পক্ষেই, যিনি নারী ও পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন।

নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ-ই প্রথমবার নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। আর ইসলামের সার্বজনীন বিপ্লবী আদর্শে সবার আগে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একজন নারী- উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদীজাতুল-কোবরা (রা) তায়ালা আনহা। এরপর থেকে ইসলামের গোটা ইতিহাসে মুসলিম নারী তার নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

সমতা ও সমান অধিকারের স্লোগানে আজ চারদিক ভারী হয়ে উঠেছে। সমান অধিকার নিতে হলে যে সমান দায়িত্বও বহন করতে হয়-তা বুঝতে নারাজ তথাকথিত জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীরা। এই সমান অধিকার ও নারীবাদের বিষবাষ্প আজ দূষিত করে তুলছে

মুসলিমদের পারিবারিক জীবনকে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে নারী। অধিকার হারাচ্ছে পুরুষ। আর অনাদর ও অবহেলায় শৈশব কাটাচ্ছে শিশু। পশ্চিমা নারী স্বাধীনতার স্লোগানধারীরা আমাদের নারীদেরকে পশ্চিমা নারীর মতো স্বাধীন বানাতে চাচ্ছে। পশ্চিমা নারীর মতো বন্ধনহীন বানাতে চাচ্ছে। বানাতে চাচ্ছে তাদের মতোই গৃহহীন। অথচ এই স্বাধীনতার আড়ালে নারীর জন্য অপেক্ষা করছে এক বিভীষিকাময় জীবন। যে জীবনে নারীর কোনো বাবা নেই। ভাই নেই। স্বামী নেই। সন্তান নেই। যে জীবনে তার চারপাশে ঘুরঘুর করছে লোভাতুর কামনাসক্ত পুরুষ। তাকে খুবলে খাওয়ার জন্য ওত পেতে আছে ক্ষুধার্ত হায়নারা; কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য নেই কোনো বাবা ও ভাই। তাকে আগলে রাখার জন্য নেই কোনো স্বামী। এটা এমন জীবন, যে জীবনে একবার প্রবেশ করার পর হাজারবার তা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা।
যারা নারীর অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে জানে না, সে সকল নারী-পুরুষ 'নারীদের স্বাবলম্বী' হওয়ার অজুহাতে পুরুষদের কাজ-কর্মে অংশীদার হওয়ার আন্দোলন করছে।

অভিমত

আমরা কেন আমাদের নারীদেরকে পশ্চিমাদের এজেন্ডাবাহীদের ফাঁদে পা ফেলার সুযোগ দেবো? কেন আমরা তাদেরকে বিভীষিকাময় জীবনের পথে পা বাড়ানোর ফুরসত দেবো? কেন আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দেবো না তাদের আসমানি অধিকার? তারা তো আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে এই পৃথিবীতে কী আছে আমাদের? মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হয়ে তারা আমাদেরকে অনবরত যে মমতা ও মায়ার ছায়ায় আবৃত করে রাখছে তার দায় আমারা কী দিয়ে মেটাব? তাই আমাদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে মুসলিম নারীর আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার। সচেতন করতে হবে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত ও ভূমিকা সম্পর্কে। বোঝাতে হবে-একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, একটি সুন্দর সমাজের জন্য এবং একটি সুন্দর জাতির জন্য নারীর ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। আশ্বস্ত করতে হবে যে, নারীকে তার রব যতটুকু দিয়েছেন তারচেয়ে বেশি কেউ দিতে পারে না। কারণ, তিনি মহান। তিনি কখনোই তাঁর সৃষ্টির প্রতি অবিচার করেন না।

প্রথম অধ্যায়

নারীকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন?

সৃষ্টিকর্তা জানেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অন্যরা এখানে নাক গলাবার কিছুই নেই। বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী জাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون(

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলার (কুদরতের) নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (সুখ-শান্তির) জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবন সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা রূম-২১)

উল্লেখিত আয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা নারী জাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও রহস্য বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা তাদের কাছে পৌছে সুখ-শান্তি ও মানসিক শান্তি লাভ কর। এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পৃক্ততায় যত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার সবগুলোর সারমর্মই হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। পবিত্র কুরআনে 'সুকুনত' শব্দটির দ্বারা যাবতীয় মনের প্রশান্তিকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া নারী-পুরুষের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের মূলই হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে সকল পরিবারে এই শান্তি ও সুখ বজায় রয়েছে, সেসব পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর যে সকল পরিবারে মনের শান্তি ও সুখ নেই, সেসব পরিবারে বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। আর এই মনের শান্তি ও সুখ তখনই লাভ করা সম্ভব হয়, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তা আদায় করে নেয়। অন্যথায় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক জীবনের শান্তি বরবাদ করে দেবে। যার প্রকাশ্য নমুনা আজ আমরা আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ করছি।

অন্য এক আয়াতে কারীমায় রয়েছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا*

অর্থাৎ "তিনি সে সত্ত্বা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মানুষ থেকে, আর তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া (স্ত্রীকে), যাতে তাঁর কাছ থেকে প্রশান্তি পেতে পার।" (সূরা আ'রাফ-১৮৯)

উপরোক্ত আয়াতেও নারী (স্ত্রী) যে পুরুষের শান্তির আধার এবং উৎস তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। যার সারমর্ম হলো, নারী জাতির উপর গৃহের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে ইসলাম। আর বাইরের জগৎ সামাল দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষ জাতির উপর। এমন কি গৃহের ব্যবস্থাপনার আওতায় সন্তানকে দুধ পান করানো এবং তার লালন-পালনসহ গৃহের অভ্যন্তরের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নারী জাতির সৃষ্টি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُن. َّ

অর্থাৎ, "আর মায়েরা তাদের সন্তানকে দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা-২৩৩)

দুধ পান করানো সন্তান লালনের প্রথম ধাপ। পরবর্তী ধাপগুলোও নারী ততক্ষণ পর্যন্ত পালন করবে যতক্ষণ না শিশু নিজের কাজ নিজে করতে শেখে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীনের চূড়ান্ত ফয়সালা হলো নারীরা হলো গৃহের ব্যবস্থাপক ও সংরক্ষক। প্রকৃত হেফাযতের মালিকতো হলো আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু বাহ্যিকভাবে গৃহাভ্যান্তরের হেফাযত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব নারীকেই দেয়া হয়েছে।

এ মর্মে অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-"অতএব যারা নেককার নারী, তাঁরা তাদের স্বামীদের অনুগত হয় এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের ধন-সম্পদ ও স্বীয় ইজ্জতের সংরক্ষণ করে"। (সূরা নিসা-৩৪)। উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় নারীকে গৃহের অভ্যন্তরের দায়িত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। ইসলামে নারীর মূল্যায়ন ও তার অধিকার কেননা, পুরুষরা কামাই-রোযগারের জন্য ঘরের বাহিরেই অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। তাদের অনুপস্থিতিতে গৃহের মালামাল ও সন্তানের দেখাশুনার দায়িত্ব নারীর উপরই অর্পিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উত্তম নারী (স্ত্রী) সে, যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তুমি আনন্দিত হবে। আর যাকে আদেশ দিলে সে আদেশ মেনে চলবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে তখন সে তোমার ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং নিজের ইজ্জত সংরক্ষণ করবে।"

(কানযুল উম্মাল-১৬/২৮২)

এ হাদীসের দ্বারাও বুঝা যায় যে, নারীকে গৃহের অভ্যন্তরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই পাহারাদার ও রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর (শাসক) জনগণের উপর রক্ষক। তাকে অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের উপর রক্ষক। তাকে তার অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানদের রক্ষক। সুতরাং তাকে তার যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"
(বুখারী, মুসলিম)
এ হাদীসের দ্বারাও নারীর প্রতি অর্পিত দায়িত্বের সীমানা কতটুকু তা পরিস্কার হয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, পুরুষ বাহিরের কাজ করে ঘরে আসবে স্ত্রীর কাছে প্রশান্তি ও মানসিক শান্তির জন্য। কিন্তু ঘরে এসে দেখবে শান্তির নীড় স্ত্রী বাহিরের অতিরিক্ত বোঝা বহনে চাকুরীতে রত, যারফলে ঘরে উপস্থিত নেই। এখন পুরুষটি প্রশান্তি পাবে কোথায়? বা তার ঘরের দায়িত্ব পালন করবে কে?

ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারী

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা পবিত্র ইসলাম-ই পৃথিবীতে নারীকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নারীকে ইসলাম কতটুকু মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে আর তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারী উন্নয়ন, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারীর সম-অধিকার ইত্যাদি মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে নারী জাতিকে কোথায় নামিয়েছে বক্ষমান নিবন্ধে সে বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি। এ বিষয়ে আমরা এখানে প্রথমত:ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কী ছিল সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াসী হবো।

১. চীন সমাজে নারী

চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে লেখেন- "আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে

নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।" তারই এক নীতিকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- "নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছু নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোনো দেবতা; কিন্তু মেয়েদের জন্মমুহূর্তেও আনন্দের সানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তখন বন্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় যেন কোনো মানুষ তাকে দেখতে না পায়, আর যখন সে নিজ গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।"'

২. প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে নারী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দানকারিণী রূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামির জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। (বিশ্ব ইতিহাস-৩৯৪, বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজে আজও নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্মমতে নারীর কোনো অধিকার বা মর্যাদা নেই।) মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্য দুঃখজনক হয়, তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাশই হোক না কেন। কেননা, কেবল ওই জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটিমাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না; বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে।"

৩. গ্রিস সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা ছিল না এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে

করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বন্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এ ছাড়া নারীর যদি অন্য কোনো কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্ত াবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেন: "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।" এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে; কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয়; বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনের জন্যেই।

৪. রোমান সভ্যতায় নারী

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সেই। সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই আয়ত্বাধীন ছিল। রোমান সমাজেও নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোনো রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মে নেওয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেওয়ার অধিকার ছিল না। রোমান সমাজে অন্য এক ধরনের বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে 'সর্দারি বিয়ে' বলা হতো। এর মাধ্যমে যেকোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সদারি বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো

তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও রাখতো, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্রসন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

৫. জাহেলী আরবে নারী

আরবে তো অধিকাংশ লোক তাদের ঘরে মেয়ের জন্ম হওয়ার খবর পেয়ে দস্তুরমতো দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। এমন এক সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহই তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম, সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ মনোভাব ছিল স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে এবং পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমেই গোত্রীয় মানমর্যাদা ছিল নির্ভরশীল। রইলো নারীদের ব্যাপার, তারাতো এ ধরনের কোনো কাজেই আসতো না; বরং তারা ছিল শত্রুর লোভনীয় লভ্য বস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করতো। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্য এক স্থায়ী বোঝা। কারণ সবসময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননার বিষয়। এতেকরে তাদের মাথা হেট হয়ে যেতো। কোনো কোনো গোত্রের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদি কারো ঘরে মেয়ের জন্ম হতো তখন সে তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করে এটা ভাবতো যে, এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে বাঁচতে দেবে, নাকি অপমানের এই প্রতীকটিকে হত্যা অথবা জীবন্ত পুঁতে দেবে। অনেক লোক এই শেষ সিদ্ধান্তটিই কার্যকরী করতো, অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে জীবন্ত পুঁতে দিতো। এই নিষ্ঠুর ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "যখন তাদের মধ্যে কাউকে মেয়ে সন্তান হওয়ার সুখবর দেওয়া হতো তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যেতো এবং সে যেন তিক্ত ঢোক গিলে নিতো, লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতো যে, এই দুঃসংবাদের
পর কিভাবে কাউকে মুখ দেখাবে। ভাবতে থাকে যে, অপমানের সাথে মেয়েটিকে নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? দেখ; কেমন মন্দ কথা, যা এরা (খোদার ওপর) আরোপ করে।""

আরবে এই প্রথাও ছিল যে, যখন কোনো স্ত্রীর স্বামী মারা যেতো তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্যে প্রয়োজন মনে করতো তাহলে তার ওপর নিজের জামা ছুঁড়ে মারতো এবং এভাবে সেই বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসে যেতো।

৬. ইয়াহুদী ধর্মে নারীর অবস্থা

ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে সকল পাপের কারণ এবং পুরুষের সাথে প্রতারণাকারী বলা হয়েছে। এ ধর্মে পিতা নিজ কন্যাকে বিক্রি করতে পারতো এবং তার কোন উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আহাদ নামায়ে আতীক' এর মধ্যে লেখা রয়েছে, নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে শাস্তি পরিবেশন করা। সে মূলত পাপের প্রস্রবন। পূর্ণ কর্মের যোগ্যতা নারীর মধ্যে না থাকার কারণে সে মান-মর্যাদা পেতে পারে না। (জীবন ব্যবস্থা, পৃঃ ৪৩)। ওল্ড টেষ্টামেন্টে বলা হয়েছে, জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার জন্য একমাত্র বিবি হাওয়া দায়ী। এজন্য নারীরা অভিশপ্ত। এক ইয়াহুদী বাদশাহ আইন করেছিলেন যে, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে বাদশাহর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে হবে।
(দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ এপ্রিল, ২০০৮ ইং)
ইয়াহুদীরা নারীদেরকে মাসিক ঋতুর সময় এত বেশী অপবিত্র ও ঘৃণা করতো যে, ঋতুবতী নারীর হাতের রান্না করা খাদ্য তারা খেতো না। এমনকি তাদের হাতের পানি পর্যন্তও পান করত না। আবার তাদের ধোয়া কাপড় তারা পরিধান করত না। এ কারণে তারা ঋতুবতী নারীকে ঋতুর সময় সংসার থেকে আলাদা করে একাকী জীবন যাপনে বাধ্য করতো। (নারী জন্মের আনন্দ, শানে নুযূল)

৭. খ্রিষ্ট ধর্মে নারী

খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তো দু'দুবার নারীদের মান খর্বকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে। অথচ এই খ্রিস্টান পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে দয়া ও স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবি করতো। এরাই নারীদের ব্যাপারে তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' থেকে এই বক্তব্যের উল্লেখসহ প্রচার করে যে- "নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এই নারী।" নারীদের ব্যাপারে

খ্রিস্টানদের ধারণাও ঠিক হিন্দুদের মনুর মতো ছিল যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা এবং পাপের প্রতিমা।" কোনো কোনো খ্রিস্টান পণ্ডিত তো আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।" তারা আরো বলেছে- "নারীদের ওপর অভিসম্পাৎ করা অপরিহার্য, কেননা বিপথগামিতার আসল কারণ এটাই।" খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আর এক গোষ্ঠীর ধারণা হচ্ছে- "নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ। শয়তান নারীর বেশ ধরে দৃশ্যমান হয়।" এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ছিল খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রিদের। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যে, "নারী কি পুরুষের মতো খোদার উপাসনা করতে পারে?" "নারী কি স্বর্গে যেতে পারবে? নারীর মধ্যে কি মানবিক আত্মা আছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবনযাপন করে?" বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না।

৮. বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন ও একদেশদর্শিতামূলক। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরূপ ও মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন। এভাবে তিনি নারীত্ব ও গৃহধর্মের আদর্শকে অবহেলিত ও অবমাননা করেন। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতেন। তাদের সমাজে নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। হিন্দু সমাজের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও মেয়ের জন্ম অলুক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হত। মেয়েরা এত স্বল্প মূল্যের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত যে, তাদের কোন ভাল নামও রাখা হত না। ক্ষুদ্র পা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে তখনকার বৌদ্ধ সমাজের প্রবাদ ছিল। এ কারণে তারা মেয়েদের পা শৈশব থেকে বেঁধে রাখত। এর ফলে মেয়েরা ক্ষুদ্র ও কদাকার হতে বাধ্য হত। তারা সব সময় পুরুষের তাঁবেদার হয়ে থাকত। জাপানেও সে সময় কন্যাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করা হত। পিতা কন্যাকে সাময়িকভাবে বেশ্যালয়ে বিক্রয় করতে বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারতেন। তারা পূজা-অর্চনায় যোগদান বা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতে পারত না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধরা নারী মর্যাদায় আগ্রহী ছিল না। বরং কিভাবে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা যায়

সে ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। রায় দীনেশ চন্দ্র বাহাদুরসহ অনেকেই বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবনতির আরো ভয়াবহ চিত্র অংকিত করে গেছেন।

পশ্চিমা নারীর গল্প

এখন আমরা আছি ইউরোপে। সময়টা খ্রিষ্টাব্দ উনবিংশ শতাব্দী। আমাদের অবস্থান এখন ব্রিটেনে। এখানে আমরা এসেছি একটি আন্তর্জাতিক বাজার পরিদর্শনে। আমরা দেখব, এখানে কী কী পণ্য নিলামে বিক্রি হচ্ছে। একজন পুরুষকে দেখলাম, তার পণ্যের নিলাম করতে হাঁক ছাড়ছে। কী তার পণ্য? তার পণ্য হলো তার স্ত্রী। নিজের স্ত্রী? হ্যাঁ, তার নিজের স্ত্রী।

তৎকালীন ইউরোপে অনেক পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত। বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি www.history.com ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে 'WIFE SELLING' লিখে সার্চ করুন। যাবতীয় ইতিহাস ও তথ্য হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়া তখন তালাক দেয়ার চেয়ে সুবিধাজনক ছিল। তাই কখনো কখনো স্ত্রীকে বেচে দিয়ে পুরুষেরা তাদের ঋণ শোধ করত। পশ্চিমা ইতিহাসের নথিপত্রে এমন বহু প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায়। তখন স্ত্রীকে মনে করা হতো পুরুষের জন্য বিরক্তিকর ও অপমানজনক। তারা নারীকে বলত Nagging woman (নরকীয় নারী)। নারীর প্রতি তাদের অবিচারের একটি দৃষ্টান্ত ছিল ধাতব লাগাম। সেই লাগামকে তারা বলত Scolds Bridle (তিরস্কারের লাগাম)। লাগামটি ছিল মানুষের মাথার মাপে লোহার তৈরি একটি খাঁচা আকৃতির। জিহ্বার নিচে ছিল কাঁটার মতো ধারালো। যাতে কথা বললে তা মুখে বিদ্ধ হয়ে যায়। এই লাগাম পরিয়ে স্বামীরা স্ত্রীদের শাস্তি দিত। এগুলোর বাস্তব চিত্র দেখতে আপনি Scolds Bridle লিখে ইউটিউবেও সার্চ করতে পারেন। নারীর কথা ও তার অভিযোগকে দমিয়ে দিতে এটাই ছিল সে সময়ে ইউরোপিয়ানদের পদ্ধতি।

এভাবেই নারীর উপর প্রয়োগ করা হতো অত্যাচারের নানান পন্থা। বিশেষত সমাজের নিম্নশ্রেণির নারীদের উপর এসব অত্যাচার ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। প্রশ্ন হলো, এই নারী এখন কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে? কীভাবে সে তার মাঝে ও পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে? কীভাবে সে সত্যকে বাস্তবায়ন ও মিথ্যাকে বিতাড়ন করবে? কীভাবে সে ইনসাফ ও অধিকার ফিরে পাবে? ইনসাফ ও অধিকারের অর্থ অনুধাবন করতে হলে তো তাকে আসমানি ওয়াহির সংস্পর্শে আসতে হবে। এমন একটি সংবিধান তো থাকতে হবে, যা পুরুষ ও নারী উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।

মুক্তির লক্ষ্যে তাই পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করল। দেখল সেখানে লেখা আছে, নারীকে সারা জীবন চুপ থেকে পুরুষের আনুগত্য করতে শিখতে হবে।তার জন্য শিক্ষার কোনো অনুমতি নেই। কখনোই সে পুরুষের উপর প্রভাব বিশ্বস করতে পারবে না। কিন্তু কেন? কারণ, সে 'হাওয়া' এর জাতি। যে হাওয়ার কারণে পুবং আদম পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সকল বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়েছে। তাই সে সকল অপরাধের মূল। মানবজাতির দুর্ভাগ্যের পেছনে সে-ই একমাত্র হোতা। এ জন্যই প্রতিপালক তাতে শাস্তিস্বরূপ সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষকে তার মনির বানিয়েছেন। পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা পেল যে, তারা শুধু পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয়নি। তাই একজন পুরুষ চাইলে তার কন্যাকে বিক্রি করে দিতে পারে।

পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মের মাঝে এই অত্যাচারের স্টিমরোলার থেকে নিজেদের মুক্তির কোনো পথ অনুসন্ধান করে পেল না। যখন আসমানি ওয়াহি নারীকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারল না, তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে পারল না, তার অধিকার আদায় ও ইনসাফের কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না-তখন কোথায় যাবে নারী? অবশেষে নারীর জন্য একটি পথই খোলা থাকল। সেই পথ হলো স্বাধীনতা ও সমতার পথ। এবার নারীকে পুরুষের কবল থেকে স্বাধীন হতে হবে। পুরুষের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নামতে হবে। কিন্তু কী হবে এই স্বাধীনতা ও সমতার রূপরেখা? যা অধিকার ও ইনসাফের বিকল্প হবে। কে নির্ধারণ করবে কোনটা অধিকার আর কোনটা ইনসাফ? ধর্ম? না, পশ্চিমা নারীর কাছে ধর্ম হলো তার প্রতিপক্ষ। তার আশ্রয়দাতা বা ত্রাণকর্তা নয়। এভাবেই তথাকথিত পশ্চিমা 'নারী স্বাধীনতা' তার যাত্রা সূচনা করল। তারা তার নামকরণ করল Women Liberation (ওম্যান লিবারেশন)। যা নিতান্তই মানবকল্পিত মতবাদ। আসমানি ওয়াহির সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

স্বভাবতই একদিকের অবহেলা অপরদিক থেকেও অবহেলার হেতু হয়। ফলে নারীমুক্তির আন্দোলনের সূচনালগ্নেই তৈরি হলো লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ। জন্মলাভ করল ফেমিনিজম তথা নারীবাদ। যা নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিলো। নারী ও পুরুষের মাঝে শত্রুতা ও প্রতিযোগিতার বীজ বপন করল। নারী যেন এবার তার প্রতি অতীত অবিচারের প্রতিশোধ নিতে নামল। এভাবেই লিঙ্গগত বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। যার সারকথা হলো-পুরুষ কখনো নিরাপদ নয়, নারী সব সময় তার

প্রতিপক্ষ এবং সব ক্ষেত্রেই সে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর নারী কখনোই কারও জন্য একবিন্দু ছাড় দিতে পাবে না। কেউই তার পক্ষ থেকে আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। শুধু নারী নিজে ও তার মতো অন্য নারীরা সেই অধিকার রাখে। তাই নারীর উপর কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকা চলবে না। জগতে বাঁচতে হলে নারীর আর কাউকে প্রয়োজন নেই। ফলে নারীর

কোনো স্বামী, ভাই বা সন্তানের প্রয়োজন নেই। নারীকে বলা হলো, তোমরা উপার্জনের সক্ষমতাই তোমার সম্মানের উৎস। যখন তুমি কাউকে তোমার জন্য খরচ করার সুযোগ দিলে, তখন তুমি নিজের সম্মান হারালে। তখন তুমি যেন তার দাসত্ব স্বীকার করে নিলে। তাই তোমার জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।

এখানে এসে কিছু বিবেক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলো। প্রশ্ন উঠল, নারীর মূল্যায়ন যদি শুধু তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ভিত্তিতে করা হয়, তবে সন্তান লালনপালন করবে কে? যদি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে প্রতিপক্ষের সম্পর্ক হয়, তাহলে কে পরিবারকে পরিচালনা করবে? সর্বশেষ কার মতামত বাস্তবায়িত হবে? এভাবে চললে তো পরিবারব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। উত্তর এল, পরিবার-সন্তান সব জাহান্নামে যাক। এসব মিষ্টি কথার আড়ালে তোমরা নারীকে আরেকবারের জন্য দাসী বানাতে চাও। এসব তোমাদের চতুর শিরোনাম। আমরা তো তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি, কেউ আমাদের আত্মত্যাগ গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। নারীর মুক্তির স্বার্থে আমরা একবিন্দু ছাড় দিতে প্রস্তুত নই। আমরা নিপীড়িত। যথেষ্ট অত্যাচার তোমরা আমাদের উপর করেছ।

এভাবেই মিলিয়ে গেল পরিবার ও সমাজব্যবস্থা রক্ষার সর্বশেষ আওয়াজ। বলা হলো, এসবের প্রবক্তরা হলো নারী স্বাধীনতার বিরোধী। তারা নারীকে আবারও দাসত্বের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিতে চায়। নারী কারও কোনো আওয়াজে কান না দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। তারা তো দীর্ঘদিন নির্যাতিত হয়েছে। এখন স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অল্পবিস্তর নির্যাতন যদি তারা করে, তাহলে তাতে দোষের কী আছে?

এ বক্তব্য লিঙ্গবিভেদ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বহু নারীর মুখে স্পষ্টই ফুটে উঠল। যেমন : আমেরিকান নারীবাদী হেলেন সোলেঙ্গার স্পষ্ট বলে দিলো, পুরুষরা আমাদের মাথায় বিয়ের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের ব্যর্থতার পেছনে বিয়েই একমাত্র দায়ী। তাই আমাদের এই বিয়েব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। নারীমুক্তির জন্য একটি মৌলিক শর্ত হলো, বিয়েব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেয়া। তাই

নারীদেরকে এখন স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা আর পুরুষের সাথে থাকবে না। ইতিহাসকে আবারও নতুন করে সেই অধ্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেখান থেকে নারীর উত্থান হয়েছিল। এবার তার শিকার হবে স্বয়ং পুরুষ। নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীদের এমন বহু বক্তব্যের নথি আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে।

এই নির্যাতিতা বিপ্লবী নারী ছিল একদল পুঁজিবাদী, নৈতিক স্খলনের এজেন্ডাবাহী, রাজনীতিক ও বিশেষ একটি মহলের সদস্যদের জন্য না চাইতেও বৃষ্টির মতো। যাদের অধিকাংশই ছিল পুরুষ। এসব লোকেরা লিঙ্গবৈষম্য ও নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে স্বয়ং নারীবাদীদের পিঠে চড়ে বসল। যে কথার স্বীকারোক্তি শেষ পর্যন্ত নারীবাদীরাই দিতে বাধ্য হয়েছিল। নারীবাদী লেখিকা ন্যান্সি ফ্রেজার ব্রিটেনভিত্তিক পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানে এই শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখেছেন, 'কীভাবে ফেমিনিজম পুঁজিবাদের দাস হয়ে গিয়েছে এবং কীভাবে পুনরায় সে মুক্তি পেতে পারে'। নারীবাদী আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ নেত্রী গ্লোরিয়া স্টাইনেম তার একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি নারীবাদী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও নারীবাদী আন্দোলনের অনেকেই মার্কিন সরকারের এই সংস্থাটি থেকে সহায়তা পায় বলে তিনি সেই সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। স্টাইনেম হলেন হলেন নারীবাদীদের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'মিস' ম্যাগাজিনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই পত্রিকাটির লক্ষ্য হলো, নারীসমাজে বিপ্লব ও স্বাবলম্বিতার চিন্তা ছড়িয়ে দেয়া। তাদের ভাষায়, 'সুপারওম্যান' তৈরি করা। স্ট্যাইনেম মূলত ইন্ডিপেন্ডেট রিসার্চ সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী। তবে তাকে কোনো গবেষণামূলক কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি তার মাধ্যমে রাজনীতিক সুবিধা নেয়ার জন্যই শুধু তাকে নিয়োগ দিয়েছে।

অতীত-ভ্রান্তির সারমর্ম এবং ইসলামের অভিমত

আমাদের সামনে অতীতে সভ্য ও অর্ধসভ্য সমাজসমূহে নারীজাতির নির্মম দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে অবস্থা অনুমান করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ- পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর কোনো মানবিক মান-মর্যাদা ছিল না। নারীর অধিকার আদায়ের কোনো চেষ্টা-সাধনা কিংবা পৃথক কোনো কর্মক্ষেত্রও ছিল

না। সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেয়ার জন্যে তার কোনো আলাদা ভূমিকা পালনের অবকাশও ছিল না। যেমন উপরে বলা

উপরের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি হয়েছে, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মান এতটা নিকৃষ্ট ছিল যে, তারা নারীর মানবিকতা এবং তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নকে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। অতীতের পণ্ডিতরা নারীকে আত্মাহীন এক অপবিত্র নোংরা অস্তিত্ব বলে মনে করতো। অধিকাংশ পুরুষই মনে করতো যে, নারীর উপাসনা করা বা সমাজে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের কোনো অধিকারই নেই।

যেমন হিন্দুদের মনুস্মৃতি অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু নারীকে মানবিক মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত বলে মনে করতো। অধিকাংশ পুরুষ তারই মতো ধারণা পোষণ করতো, মনু এবং তার অনুসারীরা নারীকে উপাসনার অধিকার

থেকে বঞ্চিত করে। পরিবারে মেয়ে ও ছেলের মধ্যেকার সমতা বলতে কিছুই ছিল না। চীনা ও আরবি ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু পুরুষরা তো তাদের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করতো। প্রাচীন অতীতে নারীর

কোনো আইনগত মান বা মর্যাদাও ছিল না। তার কোনো রকমের অর্থনৈতিক অধিকারও ছিল না। নারীর কোনো জিনিসের ওপর মালিকানা বা উত্তরাধিকারের নিষিদ্ধ ছিল। মোটকথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই নারীর ওপর কোনো অংশ ছিল না। নারীর কেনা-বেচা বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অংশ নেওয়া শোষণ-নির্যাতন চলছিল এবং পুরুষ তার স্বেচ্ছাচারী কর্তা হয়ে থাকতো। রোমান ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, নারীর নারীত্বই ছিল তার সবচেয়ে অতীতের এসব ভ্রান্তিকে এক কথায় বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে, যেহেতু বড় অপরাধ এবং এই নারীতই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ছিল যথেষ্ট। তারা নারীকে মানুষ বলেই স্বীকার করতো না এজন্যে তারা মানবিক মর্যাদা থেকে নারীকে বঞ্চিত করতো। আর এর পেছনে তাদের সম্ভবত এই যুক্তি ছিল যে, যেহেতু নারী স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল, এজন্যে জীবন-সংগ্রামের ময়দানে সমস্যাবলির মোকাবিলা করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অতীতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সবচেয়ে বড় বাধা। নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা সকল সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর নারীত্বই ছিল নারীর উন্নতি-অগ্রগতির সামনে সময়ই নারীর অধিকার ও মান-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ -এর মাধ্যমে ইসলামের

আবির্ভাবের সাথে সাথেই সেই অভিশপ্ত অতীতের সকল শোষণ ও জুলুমের অবসান ঘটে। ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নারীজাতিকে মানবিক উন্নতি-প্রগতির আসল বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, নারী পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ; বরং নারীকে তার নারীত্বের কারণে পুরুষের থেকেও বেশি মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীর স্বভাব-প্রকৃতির আলোকে তার আসল মান নির্ধারণ করে দেয় এবং তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করে দেয়। ইসলাম নারীকে সব রকমের অন্যায় বন্ধন থেকেও মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, সক্ষম, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করে। নারীজাতির যুক্তি-অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের ওপর আলোকপাত করে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী আলোচনার শীর্ষক হবে 'সম অধিকার'। সামনের অধ্যায়ে আমরা নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা, তার মালিকানা-অধিকার, তার অর্থনৈতিক স্বাধিকার, সমাজ সংস্কারে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নারী হিসেবে তার সাধারণ ব্যবহার ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোকপাত করবো। তার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নারীর 'বিশেষ অধিকার' শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এতে বিয়ে, তালাক,

মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার এবং সংক্ষেপে এও আলোচনা করবো যে, তার অধিকার ও দায়িত্ব কি? আর এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর অধিকার

বক্ষমান নিবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব, ইসলাম নারীকে কতটুকু মূল্যায়ন করেছে এবং কী কী অধিকার প্রদান করেছে। নারী জাতি তো মানুষ, তাই মানুষ হিসেবে তার মানবাধিকার কী, এটা পূর্বে বুঝে নেয়া দরকার।

মানবাধিকার কী?

মানব সন্তান হিসেবে সৃষ্টিকর্তা যে অধিকার তাকে দান করেছেন, প্রকৃত-পক্ষে সেটাই হচ্ছে মানবাধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা তার জন্মগত অধিকার। এ অধিকার সকল মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দিলেন যাতে সে সুস্থ বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে জানার ও চেনার সুযোগ পায় এবং তার প্রতি আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে তা সঠিকভাবে আদায়ে তৎপর হয়।

নারীর মানবাধিকার

মানুষ হিসেবে নারীরও রয়েছে সৃষ্টিগত এবং জন্মগত কিছু অধিকার। সুতরাং পরুষ যেমন প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্বের যে কোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার রাখে, তেমনি নারীও রাখে। অনুরূপ সকল পুরুষ যেমন নিজেদের মান-মর্যাদা রক্ষা করে চলার অধিকার রাখে, তেমনি প্রত্যেক নারীও রাখে। সুতরাং কোনো পুরুষকে অপমান করার অধিকার যেমন কোন নারীর নেই, তেমনি কোন নারীকেও অপমান করার অধিকার কোন পুরুষের নেই।

(নূরে মদীনা)

নারী জাতির প্রতি ইসলামের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করলেই নারীর মর্যাদা রক্ষা হয়। কারণ, নারীর প্রতি ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীস যা বলেছে তা শুধু তাদের মর্যাদার জন্যই নয়; বরং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও বলেছে। নারীরা তাদের মর্যাদা রক্ষা করবে এটা তাদের অধিকার। যে কাজে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এটা তাদের অধিকার নয়; বরং মানহানি। কন্যা, জায়া, জননী এ হল একজন নারীর তৃমাত্রিক রূপ। কেবলমাত্র ইসলামই তাকে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। নিম্নের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়।

মা হিসেবে নারী

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.

'আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশী দিয়েছি) কারণ, মা তাকে খুবই কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসবও করেছে কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে'।

(সূরা আহকাফ-১৫)

এমনকি মাতৃজাতির মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে মা, সৎ-মা, দুধ-মা তাদেরকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

(সূরা নিসা-২৩)

বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-'সে ব্যক্তি স্বীয় মা জননীর কপালে ভক্তিভরে চুম্বন করবে, তাঁর এ চুম্বন তাঁর ও জাহান্নামের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবে।' (বায়হাকী শরীফ ৬/১৮৭)।

এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত'।

(নাসাঈ শরীফ)

কন্যা হিসেবে নারী

বর্বর যুগে কন্যা সন্তানকে অপমান ও লজ্জার কারণ মনে করে জ্যান্ত কবর দেয়া হতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করে ইরশাদ করেন- 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো'। (সূরাহ্ তাকবীর) বর্বর যুগে যে কন্যাকে বলতো অনর্থের মূল, ইসলাম তাকে বলছে সৌভাগ্যের ফুল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সে নারী ভাগ্যবতী যার প্রথম সন্তান মেয়ে'। (রেসালায়ে আকীকা দ্রঃ)।

অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না। আমি নিজেও চার কন্যার পিতা। মেয়েরা কল্যাণময়ী ও বরকতময়ী।

(কানযুল উম্মাল দ্রঃ)

বোন হিসেবে নারী

এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির তিনজন কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন থাকে, অথবা দুইজন বা একজন কন্যা অথবা বোন থাকে আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে নারী

ইসলাম পূর্ব যুগে (বর্বর যুগে) স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা দিয়েছে নারীকে স্ত্রী হিসেবে তাঁর মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاس এ অর্থাৎ 'স্ত্রীগণ হলো তোমাদের পোশাক, আর তোমরা হলে স্ত্রীগণের পোশাক।' (সূরা বাকারা)।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف 'স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো'। (সূরা নিসা)। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'স্ত্রীগণের সহিত ভাল ব্যবহার করার জন্য আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি'।

(বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে'।

(মুসনাদে আহমদ)

এখন নারী জাতির বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। ইসলাম নারীকে যে যে অধিকার প্রদান করেছে তা বিস্তারিত লেখার সুযোগ এখানে নেই। তাই নিম্নে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরছি।

১.নারী পুরুষের সমঅধিকার

(সুরা আহযাব:৩৫)

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْقَـٰنِتَـٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَـٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَـٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَـٰتِ وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

(তাওবা:৭১)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, নামায ক্বায়িম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান।

যখন অন্ধকার অমানিশা সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখন রাসূল আরবদেশে উদিত হয়ে আলোকিত করেছেন আরবসমাজ তথা বিশ্বজগৎ।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার প্রিয়- সুগন্ধি, নারী ও নামায। নামাযের মধ্যে আমার চোখ জুড়ানো বা আত্মার শান্তি রয়েছে।"

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নারী জাতিকে মানবতার আলোকে সম্মানিত করেছেন।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন- "পুরুষ যখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন তার অর্ধেক ধর্ম পূর্ণ হয়। অতঃপর বাকী অর্ধেক ধর্ম রক্ষার জন্য আল্লাহকে ভয় করা দরকার।" এজন্য ইসলাম নারীদেরকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মূল্যায়ন করে। নর যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নারীকেও মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস, ইচ্ছাবোধ, অনুভূতি, কর্মস্পৃহা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিবেক ও সত্তার দিক থেকে নারী আর পুরুষের মধ্যে কোন বিভেদ করা হয়নি। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের অধিকার ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা হয়েছে।

পৃথিবীতে নারী পুরুষের সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী-পুরুষের একত্ব সম্পর্কে কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী আসলে কোন স্বতন্ত্র জীবসত্তা

নয়। নারীও পুরুষের মত মানুষ। যেমন মানুষ হচ্ছে এ পুরুষরা। নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধারার বিকাশে সাধিত হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। (সুরা আন নিসা :১)

নারী পুরুষ যে সর্ববিধ থেকে সমান, প্রত্যেকেরই যে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা, সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্যে একান্তই অপরিহার্য এবং কেউ কাউকে ছাড়া নয় বা হতে পারে না, তা স্পষ্টভাবে এ ধরনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে কুরআন কারীমে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের যে ব্যবধান রয়েছে তার ভিত্তি মূলত দু'টি। একটি হল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে, দ্বিতীয়টি হল তাকওয়ার ভিত্তিতে। এছাড়া মানুষ হিসেবে নর-নারীর মর্যাদা, সম্মান, ইজ্জত ও অধিকারকে পার্থক্য করা হয়নি বরং এসব বিষয়গুলো নারী আর পুরুষের জন্যে। বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা কর হলো-

ক. জন্মগত সমতা

ইসলামে জন্মগত কারণে নারী-আর পুরুষের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদার সুব্যবস্থা রাখা হয়নি। মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন। তাই পুত্র সন্তান হলে খুশীতে আটখান, আর কন্যা সন্তান হলে মুখ বিষাদের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তা ইসলাম গ্রাহ্য করে না। সুতরাং এ সৃষ্টিগত কারণে নারী আর পুরুষ তথা পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের সমতা করা হয়েছে মর্যাদা, অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। সকলেরই পৃথিবীতে সুন্দর করে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা করেন- পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি কন্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান" (সুরা শূরা :৪৯-৫০)

সন্তান হিসেবে কন্যা বা ছেলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

খ. অধিকারের সমতা

নারী আর পুরুষের মধ্যে সম্মান, ইজ্জত, সম্পদ, শিক্ষা অর্জনের অধিকারের ক্ষেত্রে কোন তারতাম্য সৃষ্টি করা হয়নি ইসলামে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে

"নারীরা তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তোমরাও নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ।" "তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অবিশ্বাস করবে?" (নাহল:৭২)

মহান আল্লাহর কাছে সত্যবাদী নারী ও পুরুষ সমান। তিনি কাউকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না বা মূল্যায়ন করেন না। তাই তিনি নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন। প্রেম, ভালোবাসা ও পবিত্রতা রক্ষায় নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে। রাসূল মন্ত্র বলেছেন- "যাকে চারটি জিনিস দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ বস্তু দান করা হয়েছে- কৃতজ্ঞ আত্মা, যিকরকারী রসনা, বিপদে ধৈর্যধারী শরীর ও বিশ্বস্ত স্ত্রী।" রাসূল তার নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আরো বলেছেন- "পৃথিবীর সব কিছুই সম্পদ। এ সম্পর্কগুলোর মধ্যে নারীই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ"। অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের ওপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে হযরত মরিয়াম (আ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "এবং পুরুষ নারীর সমান নয়"। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতে অনেক সময় নারীও পুরুষদের ওপরে গিয়ে মর্যাদায় আসীন হতে পারে। সব পুরুষ সব নারীর সমান নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ আরো নিম্নমানের আছে। এ অধিকারের ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে- "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর।"

গ. কর্তব্যবোধের সমতা

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সমান। দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা হয়নি। যার যার দায়িত্ব পালনের অগ্রাধিকার সকলের সমভাবে রয়েছে। কুরআন কারীমে এ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। " (সূরা আল মুদ্দাসিসর :৩৮) এখানে পুরুষকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে, আর নারীকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে। নর বা নারীই হোক কারো কর্মকে আল্লাহ বিফল করেন না; বরং আল্লাহর কাছে নর ও নারী সমান।

ঘ. তাকওয়ার সমতা

মহান আল্লাহ ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। যে নর বা নারী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বলেন- নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্ম সমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাংগ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাংগ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলে জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহান প্রতিদান রেখেছেন।" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর বিশ্বাসী, অনুগত, সত্যবাদিতা, ধৈর্যশীল, দানশীল, রোযা পালনকারী, যৌনাংগ, যিকিরকারী সকল নারী ও পুরুষ সমভাবে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত হবে এবং সমভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে মহা প্রতিদান অর্জন করবে।

ঙ. প্রয়োজনীয়তার সমতা

নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তা তার চাহিদা, রুচি, দৃষ্টিভংগি, সুপ্রবৃত্তি, বিবেক, পরিবেশ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। এসবের কারণে নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কিছুটা অমিল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষ হিসেবে কতগুলো অনিবার্য বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। যেমন- ১. বেঁচে থাকার পরিবেশ ও উপাদান, ২. অন্ন, ৩. বস্ত্র,

৪. বাসস্থান, ৫. চিকিৎসা, ৬. শিক্ষা, ৭. ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, ৮. যৌনসুখ উপভোগ, ৯. উত্তম আচরণের বিকাশ সাধন, ১০. পারস্পরিক আচরণে সুসম্পর্ক স্থাপন, ১১.মহানুভবতা, ১২. সুপ্রবৃত্তি অর্জন, ১৩. কুপ্রবৃত্তি দমন, ১৪. ধর্মীয় অনুশাসন, ১৫. সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ১৬. বিবেক ও মেধার বিকাশ, ১৭. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, ১৮. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়াশীল। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

চ. শাস্তির ক্ষেত্রে সমতা

যে পুরুষ বা যে নারী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, রাসূল-এর আনুগত্য করে না তাদের আবাস দোজখে। আবার যারা মুসলমান হয়েও অপরাধ করে থাকে তাদের জন্যও যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নারীদের জন্যে বিশেষ কঠিন কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। অপরাধী হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান এবং উভয়েই সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। নারী হোক, বা পুরুষই হোক অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের শাস্তি সমান। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

"যারা অবিশ্বাস করবে ও আল্লাহর আয়াতসমূহে অসত্যারোপ করবে তাদেরকে সর্বদা দোজখে রাখা হবে।"(সুরা বাকারা:৩৯)

“যারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করে না তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।”(সুরা ইমরান ১৭৭)

কোন পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের জন্যে একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহ তাআলার বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভুত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও।”(সূরা আন নূর: আয়াত-২”

ছ. ইবাদতের ক্ষেত্রে সমতা

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করার

পর তাদেরকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানব সমাজের প্রতি সুন্দর জীবন গঠনের নির্দেশ জারী করেছেন। সূরা যারিয়ার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-
"আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।"
এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো পুরুষ তার ইবাদত করার অধিকারকে হরণ করতে পারবে না বা এ বিষয়ে কোন বাধা দিতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অর্থ্যাৎ তাদেরকে সমতার বিধানে আবদ্ধ করা হয়েছে।

জ. ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সমতা

নরের ন্যায় একজন নারীকেও কালেমা বিশ্বাসের মাধ্যমে তার ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঈমানের আরকান হল ৭টি। তাওহীদে বিশ্বাসের পরেই বাকী ৬টির প্রতি ঈমান আনাও নারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে- "শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নেই। প্রকৃতপক্ষে নেকী হল, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আসমানী কিতাবের ওপর এবং নবীদের ওপর।
সুতরাং ঈমান আনয়নের পরই নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এছাড়া প্রতিটি নারীকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে, চাকর-চাকরাণিদের সাথে, শিশুদের সাথে, বড়দের সাথে ইসলামের আলোকে আচরণ ও তাদের অধিকার আদায় করতে হয়। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান নরের ন্যায় নারীও পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশীল, কল্যাণময়ী জীবন গঠন করার তাগিদ কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয়েছে। নারী নারীর জন্য, আবার পুরুষ পুরুষের জন্য- এ দৃষ্টিভংগিতে কেউ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবে না; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পরই ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন তথা আমলের মাধ্যমে নারীও অনেক সময় নরকে পেছনে ফেলে আল্লাহর নৈকট্য সহজেই অর্জন করতে পারে। আল্লাহর কাছে তাকওয়াই বড় বিষয়, নর বা নারী নয়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন- তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।" (সুরা মুলক ১-২)

এভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের দিকে নর-নারীকে অধিকার সমান রেখেছেন।

ঝ. বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী (নর ও নারী) দু'জনে মিলেই পরিবারের সূচনা করে। সূরা রাদের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই এমন সব ছেলে মেয়েদের বিয়ে দাও এবং বিয়ে দাও তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য।"

একজন নর ও একজন নারী বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের অধিকার যৌথভাবে রয়েছে। নর ও নারীর দুজনারই যৌন চাহিদা রয়েছে। এ যৌন কামনা ভোগ করার অধিকার দু'জনেরই সমান। তাই বিয়ের মাধ্যমে এ যৌন ক্ষুধাকে উপশম করার জন্য বিয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"এ ছাড়া যত নারী আছে, নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদের হাসিল করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে- যদি বিয়ের দুর্গ তাদের সুরক্ষিত করো এবং মুক্ত যৌন কামনা চরিতার্থে উদ্যত না হও।

আল্লাহ তা'আলা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন যৌন কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"(সূরা যারিয়াত-৪৯)

আল্লাহ তায়ালা যত নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন সকলে বিয়ে করেছেন। এটি হল তাঁদের স্থায়ী সুন্নত। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-

"আপনার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যও স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।"(সূরা রাদ - ৬৮)

রাসূল বলেছেন- "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য রয়েছে তাদের বিয়ে করা উচিত।" কারণ, চক্ষুদ্বয়কে কুদৃষ্টি হতে রক্ষা ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিয়ে উত্তম পন্থা। তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা যৌন কামনা দমন করে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি বিবাহিত? উত্তরে আমি বললাম, না। তিনি বললেন- বিয়ে করুন। কারণ এ উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূল-এর সর্বাধিক সংখ্যক স্ত্রী আছে।"

ঞ. ভালোবাসার সমতা

বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে নর নারীকে, নারী নরকে ভালোবাসার আদান প্রদানের মাধ্যমে পরিবারকে সুসংহত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নর-নারীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি সৃষ্টি করা। ইসলাম উভয়ের প্রতি এমন কতগুলো নির্দেশ দান করেছে যাতে করে নর নারীকে, নারী নরকে ভালোবাসতে পারে। প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসায় ভরে উঠতে পারে তাদের পরিবার। সুখীময় হতে পারে তাদের দাম্পত্য জীবন। স্বামী আর স্ত্রী যদি দুনিয়াতে পরম সুখ-ভালোবাসায় এবং ঈমান ও আমল করে দিন অতিবাহিত করতে পারে তাহলে তারা পরকালীন জীবন বেহেশতেও অর্জন করতে পারবে। সেখানে নর ও নারীকে এ অধিকার প্রদান করা হবে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে- "তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে বানিয়ে দেবো কুমারী। স্বামীদের প্রতি আসক্ত আর বয়সে সমকক্ষ।

উভয়ে যখন মুত্তাকী হবে, পরহেযগারিতা অর্জন করবে তখন তারা জান্নাতের পরস্পর বন্ধনে পরিণত হবে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-"দুনিয়ায় যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, পরকালে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকীরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবে।" নর ও নারীকে সংসার সুখের জন্য, ভালোবাসা অর্জনের জন্য, সুখ, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়ের প্রতি উভয়ের কতিপয় দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করলে পরিবারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করতে পারে। ভালোবাসা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার রয়েছে।

ঠ. উপহার বিনিময়ের সমতা

নর ও নারীর মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা গভীর করার জন্য উভয়কে উভয়ের প্রতি উপহার বিনিময় করার জন্যে ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি উপহার দেয়া। তদ্রূপ স্ত্রীরও সে দায়িত্ব রয়েছে।

রাসূল বলেছেন- "তোমরা পরস্পর উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো, দেখবে এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে- পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।" অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে- "তোমরা পরস্পরে হাদিয়া তোহফার আদান প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহফা দিলের ক্লেশ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।" দাম্পত্য জীবনের সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার জন্য রাসূল এভাবে নর ও নারীকে উপহার বিনিময়ের অধিকার প্রদান করেছেন।

ড. ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ক্ষেত্রে সমতা

নর ও নারীর মধ্যে মন মালিন্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি ধৈর্য অবলম্বন করা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, কোন অপরাধ করলে তা ক্ষমা করে দেয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে সুখীময় করার লক্ষ্যে এ বিধানের প্রবর্তন। কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালোভাবে ব্যবহার কর ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করেছ, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দিবেন।" রাসূল বলেছেন- "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম নারীকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।" এভাবে স্ত্রীদেরকে সামান্য অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে সংসারে সুখ বিরাজ রাখা স্বামীর প্রধান দায়িত্ব। কুরআনে বলা হয়েছে- "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান। তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের ওপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা জোর জবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষ ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" রাসূল এভাবে স্ত্রীদের প্রতি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার বিধান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে আদর্শ স্বামী হয়েছিলেন এবং স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে অগাধ ভালোবাসার মাধ্যমে সুখী রেখেছেন। নর ও নারীকে এভাবে ক্ষমা অথবা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সুখ-শান্তিতে ভরে দিতে পারে।

ঢ. পরামর্শের ক্ষেত্রে সমতা

পরিবারের যে কোন বিষয়ে একক সিদ্ধান্তের কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম কখনো পরিবারের বিবাদকে সমর্থন করে না। তাই নর ও নারী উভয়ে উভয়ের সাথে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া আদর্শ পরিবারের জন্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এভাবে যে কোন কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে করা হলে সেখানে দাম্পত্য জীবনে কলহ বা বিবাদের পরিবর্তে সুখ ও শান্তি তথা ভালোবাসা বিরাজ করতে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে- স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশুসন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।" যে কোন বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলে পরিবারের স্বৈরাচারী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তির কারণে সাহাবিদের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভব হয়নি। এ সময় রাসূল বা তাদেরকে এ জায়গাতে করবানী দেয়ার আদেশ দিলেন, কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। রাসূল অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে পরামর্শ নিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রথমে করবানী দেয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করার পরামর্শ দিলেন। রাসূল সে পরামর্শ মোতাবেক কাজ শুরু করলে সাহাবীগণ তাকে অনুসরণ করলেন এবং সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করলে পরিবারের কল্যাণ লাভ করা যায়। আবার স্ত্রীরও পরিবারের যে কোন কাজের ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ন. ইবাদতে পরস্পরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সমতা

আল্লাহর দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে নর ও নারী (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরকে উৎসাহ প্রদান, সাহায্য করা, সহযোগিতা করা ইসলামে বৈধ একটি ব্যবস্থা। শরীয়ত মোতাবেক জীবন গঠন, শিশুদের শিক্ষা, চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করার যে অধিকার রয়েছে তা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল বলেছেন- আল্লাহ যে পুরুষকে রহমত দান করবেন, যে রাতের বেলা জেগে উঠে নামাজ পড়বে এবং তার স্ত্রীকেও সে জন্য সজাগ করবে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন- "পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে রাতের বেলা জাগাবে। এবং দু'জনেই নামাজ পড়বে- আলাদা আলাদাভাবে এবং দু'রাকাত নামাজ একত্রে পড়বে। আল্লাহ এ স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহ ফিকরকারী পুরুষ-নারীদের মধ্যে গণ্য

করবেন।" এভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে সার্বিক সহযোগিতা করা ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ত. দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমতা

দাম্পত্য জীবনকে সুখীময় করার লক্ষ্যে ইসলাম স্বামীদের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব প্রদান করেছে এবং স্ত্রীদের প্রতিও কতিপয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা উভয়ে পালন করলে ঐ সংসারে কোন বিবাদ সৃষ্টি না হয়ে সুখ ও শান্তি তথা কল্যাণ অর্জিত হবে। একজনকে অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আরেকজনকে দায়িত্বই দেয়া হয়নি, এরকম বিধান ইসলামে নেই। এখানে স্বামী ও স্ত্রীর যে এ দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে-

স্বামীর দায়িত্ব: প্রথমে স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তার অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। স্ত্রীদের সাথে কোন কঠোর আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে। রাসূল বলেছেন- মেয়ে লোক পাজরের হাড্ডির ন্যায়। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, ভেংগে যাবে। আর যদি ব্যবহার করতে চাও তা হলে এ অবস্থাতে ব্যবহার করবে।

স্ত্রীদের ওপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস, বিদ্রূপ করা, ধর্ষণ করা স্বামী হিসেবে নরের জন্য নিষিদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে- তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। "আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেলার বস্তুতে পরিণত করো না।" স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করা আল্লাহর নির্দেশ। রাসূল বলেছেন- "তোমার স্ত্রী-অঙ্গশায়িনীকে এমন নিমর্মভাবে মারধর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।" স্ত্রীদেরকে মারধর করা, গালিগালাজ করা এবং তাদের সাথে কোনরূপ অন্যায়-জুলুম জাতীয় আচরণ করাকে নিষেধ করে রাসূল বলেছেন- "তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধর করো না এবং তাদের মুখমণ্ডলকেও কুশ্রী ও কদাকার করে দিও না।" কুরআনে বলা হয়েছে- "আর যেসব স্ত্রীলোকের আনুগত্যহীনতা ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় কর তাদের তোমরা সদুপদেশ দিয়ে ভাল করে বুঝাবে। (এতেও যদি বিনয়ী না হয় তাহলে পরবর্তীতে) মিলন শয্যা থেকে দূরে রাখ। (তাতেও

যদি কাজ না হয় তাহলে তাদের মারো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তোমাদের সাথে অসদাচরণের কোন পথ তালাশ করো না।

এজন্য স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহারের নির্দেশ ইসলামে দেয়া হয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভালো প্রদর্শন করা ইসলামের নির্দেশ। রাসূল বলেছেন- "যে নিজে অন্যের ব্যবহার কর।" স্বামীকে সবসময় স্ত্রীর রোগ শোক ও বিপদ-আপদে সহানুভূতি ওপর দয়াপরবশ হয় না, সে কখনো অন্যের দয়া ও সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।" সুতরাং স্বামীদেরকে স্ত্রীদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীর গোপন কথা স্বামীদেরকে প্রকাশ করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা তার দায়িত্ব। রাসূল বলেছেন- "যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও যে স্ত্রী মিলিত হয় স্বামীর সঙ্গে, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রচার করে সে স্বামী আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি।" এভাবে স্বামীদের কর্তব্য হচ্ছে কথায় ও কাজে স্ত্রীকে আনন্দ দান করা, নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে যেতে দেওয়া, স্ত্রীদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ না হওয়া, স্ত্রীকে খাটো না করা বা খোটা না দেয়া। দাম্পত্য জীবনে সুখ ও ভালোবাসা রক্ষার্থে স্বামীদেরকে এসব দায়িত্ব পালন করার বিধান ইসলামে প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়া খুব সহজ হয় এবং সংসারও সুখের হয়।

স্ত্রীর দায়িত্ব: স্বামীর প্রতি যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করলেই যে সচরাচর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এরূপ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। স্ত্রীদের প্রতি যেসব দায়িত্ব দেয়া আছে তাও তাকে পালন করা জরুরী। যখন নর ও নারী হিসেবে দুজনেই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবে তখন নর-নারীর মধ্যে অধিকার, মর্যাদা ও বৈষম্য থাকতে পারে না। স্ত্রীরা হলো স্বামীর ঘরের রাণী। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে "নারী তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী।" স্বামীর খেদমত করা, গোপন কথা প্রকাশ না করা, আনুগত্য থাকা, পরামর্শ গ্রহণ করা, উপঢৌকন প্রদান করা, হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা করা, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। ইবনে মাজায় উল্লেখ আছে- "আর স্ত্রীর প্রতি যখন স্বামী দৃষ্টিপাত করে তখন স্ত্রী তাকে আনন্দিত করে দেয়।"

সুখীময় দাম্পত্য জীবন, সুখ, শান্তি ও কল্যাণ ভোগের অধিকার নর ও নারী হিসেবে স্বামী ও স্ত্রীর সমভাব রয়েছে। এজন্য দুজনার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার জরুরী। ঈমান ও আমলের দিক থেকে স্বামী ও স্ত্রীকে অত্যন্ত তাকওয়া অর্জন করাও দরকার। তাহলে স্বামী স্ত্রীর অধিকারে ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আর কোন

বৈষম্য থাকবে না এবং নারীও নরের মত মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামের বিধান পালনের ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এছাড়া ঈমান, বিশ্বাস, আকীদা, আমল, জ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইচ্ছাবোধ, প্রজ্ঞা, সজ্ঞা, বিবেক বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে নর ও নারীর মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয়নি। মৌলিক অধিকার, যৌন অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, বিয়ে করার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, জান, মাল, ইজ্জত নিরাপত্তার অধিকার, মতামত জ্ঞাপনের অধিকার, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ভালোবাসার অধিকার এবং স্বামীকে ভালোবাসা প্রদানের অধিকার, এগুলোর ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ হিসেবে নর ও নারীর মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য বা মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে তা বাস্তবায়ন বা ভোগ করার ক্ষেত্রে অধিকারের তারতম্য হয় না। তবে শারীরিকভাবে নর ও নারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ সৃষ্টিগত কারণে কর্মক্ষেত্রেরও পার্থক্য রয়েছে। তবে তাকওয়ার ক্ষেত্রে নর বা নারী হিসেবে কোন পার্থক্য নেই। তাকওয়ার মানদণ্ডের ক্ষেত্রে নরের মধ্যে নরের, আবার নারীর মধ্যে নারীর, আবার নরের মধ্যে নারীর, আবার নারীর মধ্যে নরের পার্থক্য হতে পারে। শারীরিক তারতম্যের কারণে পুরুষদের কতিপয় অধিকার তৈরি হয়েছে নারীদের ওপর, আরব নারীদের কতিপয় অধিকার অর্জিত হয়েছে নরদের ওপর।

নারী জাতির ধর্মীয় অধিকার

অন্যান্য ধর্মে যেখানে নারীকে সকল পাপের উৎস এবং শয়তানের প্রবেশদ্বার বলা হয়েছে, সেখানে ইসলাম নারীকে অমূল্য সম্পদ, পুরুষের অর্ধাঙ্গীনী, পুরুষের ভূষণ ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করে। পুরুষের পাশাপাশি যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীতে নারীকে কোথাও সর্বোচ্চ অধিকার, আবার কোথাও সমান অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

যে ঈমানদার হয়ে নেক কাজ করে, পরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে (উভয় জাহানে) পবিত্র জীবন দান করবো এবং প্রতিদানে তাঁদেরকে তাঁদের উত্তম কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তাঁরা করত'।

(সূরা নাহল-৯৭)

উল্লেখ যে, সর্বপ্রথম যিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে সর্বপ্রথম নামায আদায় করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন নারী, যার পবিত্র নাম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রদ্বিয়াল্লাহ আনহা)। এমনকি সর্বপ্রথম যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দ্বীনের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একজন নারী। যার পবিত্র নাম হযরত সুমাইয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

ইসলামে নারীর মালিকানা ও অর্থনৈতিক অধিকার

নারী জাতিকে ইসলাম মালিকানা অধিকার এমনভাবে প্রদান করেছে যে, একজন নারী জমি-জমা, ধন-দৌলত, মিল-কারখানা, দোকান-পাট, গাড়ী-বাড়ী গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরী, হাউজিং সোসাইটিসহ যে কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারে। যেমনটি পারে একজন পুরুষ। এমনকি বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে দেনমহর স্বরূপ যতটুকু অর্থ বা সম্পত্তি দেয়া হয় তার পুরোটার মালিকও সেই নারীই হয়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا*

অর্থাৎ, 'পুরুষ যা অর্জন করবে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করবে, সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত'।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

(সূরা নিসা-৩২)

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ রয়েছে, অল্প হোক আর বেশী। এ অংশ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত।

(সূরা নিসা-৭)

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(

পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাদের (স্ত্রীদের) প্রয়োজন মত খোর-পোশ প্রদান

(সূরা বাকারা-২৩)

পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যথাযথভাবে স্ত্রীদের পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর ফরয'। (বুখারী)

পিতার সম্পদে নারীর (কন্যার) অংশ পুরুষের (ছেলের) তুলনায় কম কেন?

আধুনিক যুগে ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত তথাকথিত প্রগতিবাদী, নারীবাদীদের এহেন কান্ডজ্ঞানহীন এ প্রশ্নটি বড়ই উদ্ভট। আল্লাহর বিধানে উপর্জনের দায়িত্ব পুরুষের। আর তাতে ভোগ দখলের অধিকার রয়েছে নারীর। এ জন্যই নারীকে আজীবন লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ প্রদান করা পুরুষের দায়িত্ব। নারী জন্ম থেকে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব বর্তায় তার পিতার উপর, আর বিয়ের পর থেকে আমরণ এর দায়িত্ব বর্তায় স্বামীর উপর। এছাড়া নারীর নিজের ব্যয়ভার যেমনভাবে তাকে বহন করতে হয় না, তেমনিভাবে তার দাম্পত্য সঙ্গীর এবং তার গর্ভজাত সন্তানের ব্যয়ভার বহন করারও দায়িত্ব তার নেঈ। পক্ষান্তরে পুরুষ সাবালেগ হওয়ার পর থেকে বিবাহপূর্ব জীবন ও দাম্পত্য জীবনে তাঁর নিজের ব্যয়ভার ঔরশজাত সন্তানের লালন-পালন ও দাম্পত্য সঙ্গীনীর ভরণ-পোষনের দায়দায়িত্ব শুধুমাত্র তার উপরই বর্তায়। তাই দেখা যাচ্ছে, পুরুষ তার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যে অংশ পায় তা ব্যয়ের জন্য উপরোক্ত তিনটি খাত (অর্থাৎ নিজের, স্ত্রীর ও সন্তানের) নির্ধারিত। এছাড়া আরও একাধিক ব্যয়ের খাত রয়েছে। পক্ষান্তরে নারী তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে যেটুকু অংশই পায় সেগুলো তার নিজের। করো ব্যয়ভার তার গ্রহন করতে হয় না। এমনকি নিজেরও না। সুতরাং এ সকল অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য পুরুষদের জন্য নারীদের তুলনায় বেশী সম্পদের অবশ্যই প্রয়োজন। এমতাবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান সম্পত্তি দানের প্রস্তাব কত যে উদ্ভট ও কাণ্ডজ্ঞানহীন তা সুস্পষ্ট। ইসলামের এ সুমহান নীতি এবং ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণেই অজ্ঞশ্রেণীর নারীবাদীরা সম্পত্তিতে নারীপুরুষের সমান অধিকারের শ্লোগান তোলে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

'তোমরা আকাংখা করো না (সমান অংশ পাওয়ার) এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'(সূরা নিসা-৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ُتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار

'এসবই (মীরাছের প্রদত্ত বিধান) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।(সূরা নিসা-১৩)

ইসলামে নারীর শিক্ষা অধিকার

'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' প্রবাদটি গোটা জাতির জন্য প্রযোজ্য। নারী-পুরুষ উভয়ে মিলেই মানব জাতি। জাতির মুক্তির দূত, জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ঈমান আমলের সঙ্গে সঙ্গে জরুরত পরিমান ইলম শিক্ষা করাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর (ধর্মীয়) জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয'। (ইবনু মাযাহ শরীফ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পুরুষ সাহাবীগণ যেমন জ্ঞান শিক্ষা করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষা লাভ করতেন। তবে সহশিক্ষা নয়, নারীর জন্য তিনি আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (রহ.) এ বিষয়ে আলাদা পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, দাসীদের জ্ঞানশিক্ষা দানেও ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির নিকট একটি দাসী রয়েছে, আর সে তাকে জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং খুব যত্ন সহকারে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে স্বাধীন (মুক্ত) করে বিবাহ করে দেয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুন সাওয়াব।"(বুখারী শরীফ)

ইসলামে নারীর বৈবাহিক অধিকার

একজন মুসলিম নারী নিজ পছন্দ মত যে কোন একজন মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকার রাখে। অভিভাবকগণ তাকে জোর করে বিবাহ দিলে উক্ত

বিবাহ টিকিয়ে রাখা না রাখার অধিকার নারীকে ইসলাম প্রদান করেছে। বিবাহে নারীর অধিকার সম্পর্কে মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অর্থাৎ, ‘‘তিন তালাক প্রাপ্তির পর নারী পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল নয়, যাবৎ না সে অন্য স্বামী গ্রহন করে।"(সূরা বাকারা)

উপরোক্ত আয়াতে অন্য স্বামী গ্রহণ করার অধিকার নারীর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। তবে উল্লেখ করা ভাল, নারী যদি অসমশ্রেণীর বংশের সাথে বিবাহ করে থাকে, তাহলে অভিভাবকগণ আদালতে মেয়ের বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রাখে। কেননা, এতে তাঁর বংশীয় মর্যাদার প্রশ্ন। এছাড়া এতে করে তাঁর বংশের অন্য মেয়েদের বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, 'এক বালেগা কুমারী মেয়ে নবীজীর কাছে এসে বলল, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। একথা শুনে নবীজী তাকে এ স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার দিয়ে দিলেন।' (আবু দাউদ শরীফ)। এছাড়া আরও অনেক হাদীস এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে।

ইসলামে নারীর মহরানা অধিকার

মানবতার ধর্ম ইসলামে মুসলিম নারীকে যতগুলো অধিকার প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে দেনমহর একটি বিশেষ অধিকার। বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর প্রতি অর্পণ করার বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে বিধান-সম্মতভাবে যে অর্থ লাভের অধিকারী হয়, সে অর্থকে 'মহরানা' বলা হয়।

স্ত্রীর প্রতি সম্মানার্থেই উক্ত মহরানা ধার্য করা হয়েছে। এ অধিকারে আর কাহারো কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

'নারীদের মহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'। (সূরা নিসা-৪)

নারীর মহরের অধিকার সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা উল্লেখ করা হল না।

জীবনোপায়ে সমান অধিকার

অর্থনীতি সম্পর্কে ইসলাম বলে জগতের সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু আল্লাহর যেহেতু সম্পদ ভোগ করার প্রয়োজন নেই, তাই তিনি সমস্ত সম্পদে বান্দাদেরে ভোগ করার অধিকার প্রদান করেছেন।
(সূরা লোকমান-২০)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৃষ্টিগত কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে বেঁচে থাকার অধিকার, জীবনোপায়ের অধিকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যোগ্যতার ভিত্তিতে জীবিকা উপার্জন নারী আর পুরুষে পৃথক পৃথকভাবে আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অর্জন করার অধিকার সমান। কবি নজরুলের ভাষায় 'নর বহে কল, নারী বহে জল, সেই জল মাটি মিশে ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে'। মানুষের জীবিকা অর্জনে গুণ ও মানগত পার্থক্য হতে পারে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে একটি লোককেও তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কারণ, আল্লাহর নিকট জীবিকার অধিকার সবার জন্য সমান। এই সমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা
ইরশাদ করেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ, 'পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজে গ্রহন করেছেন।'(সূরা হুদ-৬)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- "আমরা তোমাদের জন্য এবং যাদের তোমরা জীবিকা প্রদান করো না, তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবিকার উপকরণ তৈরী করে রেখেছি।" (সূরা হিজর-২০)

পবিত্র কুরআনের উপরুক্ত আয়াতগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থাৎ, 'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'(সূরা নিসা-৩২)

আলোচ্য আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনোপায় আল্লাহর চিরন্তন দান। তা থেকে প্রতিটি মানুষ তথা প্রতিটি প্রাণীর উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

এত অধিকার দেয়ার পরও ইসলামের উপর অপবাদ কেন?

উপরে বর্ণিত প্রশ্নটির জবাব দীর্ঘ। তবে, এর জবাব বুঝার পূর্বে আরেকটি প্রশ্ন বুঝা দরকার। তাহল, ইসলাম ও তার হুকুম-আহকামের উপর অপবাদ দেয় কারা? জবাব হল, প্রথমতঃ ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম সম্প্রদায়। দ্বিতীয়তঃ ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের তল্পীবাহক, অর্থলিপ্স, তথাকথিত নামধারী মুসলমানরা। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম বিদ্বেষীদের এহেন জঘন্য অপবাদ সুস্পষ্ট। পূর্ব থেকেই ইসলাম তার প্রতি আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আসছে। যার ফলে তাদের উত্থাপিত অপবাদ ও অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন, অসার এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাকী রইল দ্বিতীয় প্রকার তথাকথিত মুসলমানদের কথা। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক যুগে তথাকথিত নামধারী কিছু মুসলমান, যারা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের দালাল, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মদদপুষ্ট হয়ে তারা কখনও আল্লাহর প্রতি, কখনও রাসূলের প্রতি, কখনও কুরআনের প্রতি ভিত্তিহীন এসব অপবাদ ও অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে। আবার কখনও মৌলবাদ, কখনও নারীদের প্রতি বৈষম্যনীতি, প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুখরোচক নানা শ্লোগান তোলে তারা। তাদের আচরণ অস্থিতিশীল করার জন্য যে অশুভ চক্রটি বহুদিন যাবৎ ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে দেখে এটা বুঝতে বাকী নেই যে, বাংলাদেশ ও বাংলদেশের মুসলমানদেরকে তাদেরই অর্থপষ্ট এনজিওদের দালালদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার দূরভিসন্ধি নিয়ে এদেশে তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। দেশের নব্বইভাগ মুসলমানদের ধর্ম ইসলামকে আঘাত করার প্ররোচনা দিয়ে দেশকে উত্তপ্ত কর এবং সেই অজুহাতে বাংলাদেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয়ার পায়তার চলছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য বল্গাহীন নারী স্বাধীনতার উন্মত্ততায় উচ্ছন্নে যাওয়া বিপর্যস্ত পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে এদেশকে ইসলাম শূন্য করার ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। তারা জানে, নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করা গেলে এর কুফল পড়বে প্রতিটি পরিবারে। আর এভাবে গোটা মুসলিম সমাজকেও ধ্বংস করা সহজ হবে। সেজন্য প্রথমে তারা ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা শুরু করে। ১৯৭৯ ইংরেজীতে জাতিসংঘে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধনের নামে তৈরী করা হয় ইসলামী শাশ্বত

বিধানের বিরোধী এক চরম ইসলাম বিদ্বেষী সনদ। এই সনদের নাম সিডাও। এ সনদের বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমাদের আর্থিক সাহায্যে গড়ে তোলা হয় একের পর এক তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন। এবং ছড়িয়ে দেয়া হয় তাদেরকে সর্বত্র। এরা সমাজে একটি স্থায়ী বিভাজন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইসলামকে নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর জঘন্য মিশন নিয়ে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান সময়কে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উপযুক্ত মনে করেই এই সিডাও নামক সনদের সম্পূর্ণ অনুসরণে তৈরী করা 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'কে আইনে পরিণত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু নারী-লিদু অসৎ স্বভাবের ভোগবাদী পুরুষতো আছেই এমনকি নারী সমাজেরও কেহ কেহ পশ্চিমা ধাঁচের সেই জঘন্য নারী নীতিকেই এদেশে বাস্তবায়নের জন্য জিগির তুলেছে। এর পেছনে তাদের আসল উদ্দেশ্য যে কী তা কারোরই বুঝার বাকী নেই। তথাকথিত নারী লিঙ্গু প্রগতিবাদীরা সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করে যে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, তার একমাত্র বাধা হচ্ছে ইসলাম। সে জন্যই কুমতলব বাজদের কুমতলবে বাধা পড়ার কারণে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকছে। এবং নারীদেরকে অপূর্ব ও যথাযথ অধিকার দেয়ার পরও ইসলামের প্রতি অপবাদ দিচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়েজনীয়তাঃ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

চলতি শতাব্দীর শুরুতেই যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিম বিশ্বের যোগসূত্র হচ্ছি হলো, তখন আমাদের সামাজের নারীদের সমস্যা সমাধানে সমাজ সংস্কারকনে মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। কেননা যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত অধপতন, অবসে ও অধিকারহীনতা আমাদের নারী সমাজকে তখন চরম দুর্দশায় নিপতিত করে রেখেছিল ফলে আমাদের সমাজের উন্নয়নে ও জাতীয় উত্থানে তাদের আর কোন কার্যকর ভূমি পালনের অবকাশ ছিলনা।

সংস্কারের দুইটি পন্থা

সংস্কারকামীদের অধিকাংশই দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগী পোষণ করতো:

১. যারা ইসলামকে জানতেন, ইসলামে নারী জাতিকে যে উচ্চ মর্যাদার আসন দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং মুসলিম নারী হিসাবে তার যাবতীয় বৈশি সংরক্ষণ করার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তারা মুসলিম জনগণকে ইসলামে উত্তরাধিকার দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং নারীর উন্নয়ন ও সংস্কারে বিভিন্ন জাতি যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানালেন।

২. পাশ্চাত্যে চোখ ধাঁধানো নগর সভ্যতায় যাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং পাশ্চাতের চালচলন ও জীবনধারায় যারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তারা স্বজাতিকে এই বলে আহবান জানাতে লাগলো যে, আমাদের সমাজের নারীদেরকে উন্নতি ও প্রগতি অর্জন করতে হলে পাশ্চাত্যের রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং তাদেরকে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সংস্কারকরা এই দু'টি দৃষ্টিভংগীর অনুসারী হয়ে দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমি সেই তৃতীয় শিবিরটির উল্লেখ করছিনা, যারা নারীনে বিরাজমান পরিস্থিতিকে পুরোপুরি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিল এবং তাদের জীবনে আদৌ আর কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করতোনা। এদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করবেনা। কেননা আমি তাদেরকে বাস্তবতাবাদী মনে করিনা। যুগ যুগ ধরে অধপতন ও পশ্চাদমুখিতার ফলে নারী সমাজ যে শোচনীয়

অবস্থায় পতিত হয়েছিল, তা অব্যাহত থাকার সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তারা উপলব্ধি করেন যার আমার মনে হয়না।

নারীর অবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে উল্লেখিত দু'টি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগীর প্রতিফল যে আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রীয় আইন কানুনে পড়বে, সেটা এক রকম অনিবার্য ছিল বলা যায় তাই দেখা যায়, প্রচলিত আইন কানুনে কোথাও নারীদের ব্যাপারে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে বিধিসমূহ হুবহু প্রযুক্ত হয়েছে। আবার কোথাও বা দেখা যায়, ঠিক তার বিপরীত বিধি রচিত হয়েছে। আমি যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, এই সকল বিধির পর্যালোচনা করবো।

সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ

আমাদের মুসলিম দেশগুলোর আইনকানুনে নারী জাতির উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে যেসব পরিবর্তন সাধিত ও বিধিসমূহ রচিত হয়েছে, তাকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি:

(ক) ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ

(খ) রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ

(গ) সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ

নারীর ব্যক্তিগত অধিকার

এ কথা সুবিদিত যে, আমাদের পারিবারিক নিয়ম বিধি সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিশর ও ইরাকে শত শত বছর ধরে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে। আর লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে মালেকী মাযহাব থেকে, হেজাজ ও অন্য কয়েকটি দেশে শাফেয়ী মাযহাব থেকে এবং সৌদী আরব, কুয়েত ও আরব আমীরাতে হাম্বলী মাযহাব থেকে গৃহীত হয়ে এসেছে।

জনগণ কখনো কোন বিতর্কে লিপ্ত হলে শরীয়তের বিশেষজ্ঞ কোন ফকীহ বা মুফতীর কাছে যেত এবং সেই ফকীহ বা মুফতী নিজ অনুসৃত মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তি করতেন।

এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক মাযহাবেই এমন কিছু বিধি চালু আছে, যা পরিবারের স্বার্থের সহায়ক নয়। বিশেষতঃ সভ্যতা, সামাজিক রীতি প্রথা ও ঐতিহ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে সেগুলো অনেকাংশে বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে। এজন্য তুরস্কের উসমানী খিলাফাত নিজ শাসনামলের শেষের দিকে পরিবার সংক্রান্ত কিছু ইসলামী বিধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সূচনা করে। ১৩৩৬ হিঃ সনে হানাফী মাযহাবের

কিছু অভিমত এবং অন্যান্য মাযহাবের কিছু অভিমতের সমন্বয়ে 'পারিবারিক অধিকার আইন' জারী করে। অনুরূপভাবে মিশর ও হানাফী মাযহাব বহির্ভূত কিছু সিদ্ধান্ত ও মতামতের ভিত্তিতে নতুন পারিবারিক আইন চালু করার উদ্যোগ নেয়।

১৯৫১ সালে সিরিয়াতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পারিবারিক আইন জারী করা হয়। এতে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের মতামত গ্রহণ করা হয়। এ আইনের শেষ ধারায় বলা আছে যে, যে ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে আইনের কোন ধারা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করা হবে।

অনুরূপভাবে জর্ডান, তিউনিস, মরক্কো ও ইরাকে প্রচলিত মাযহাবসমূহের মতামতের সমন্বয়ে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে। তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসহ এই দেশগুলিতে প্রধানত পারিবারিক আইনের কোন কোন বিধি সরাসরি শরীয়তের বিরোধী।

আরব দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে প্রচলিত পারিবারিক আইনসমূহের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সব দেশে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য ও তদনুসারে আদালত পরিচালিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে যে ক্ষোভ স্তূপীভূত ছিল, তা নয়া আইন চালু হওয়ায় অনেকাংশে দূর হয়েছে। বস্তুতঃ একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের আনুগত্য সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে, এরূপ চিন্তাধারা শরীয়ত দ্বারাও সমর্থিত নয়, আর তা জনস্বার্থেরও অনুকূল নয়।

আমার এ আলোচনাকে আমি সিরীয় ও মিশরীয় পারিবারিক আইন সংস্কারের পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। কেননা অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশেও সম্ভবতঃ অনুরূপ সংস্কারই সম্পন্ন হয়েছে।

১. বিবাহ বিধির সংস্কার

বিবাহ বিধি সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বপ্রথমেই আসে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের প্রসংগ।

(ক) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ: ইসলামের প্রধান প্রধান চারটি মাযহাবের ও অন্যান্য ছোটখাট মাযহাবের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা যৌবনে পদার্পণ করেনি এমন বালক বালিকার বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ। এই মতের স্বপক্ষে তারা আল কোরআনের বহু সংখ্যক উক্তির আলোকে কৃত ইজতিহাদ, রাসূল (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের যুগে সংঘঠিত ঘটনাবলীকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন।

তবে ইবনে শাবরুমা প্রমুখ মুষ্টিমেয় সংখ্যক ফকীহ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ সর্বতোভাবে অশুদ্ধ ও অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের মতে, এই সকল বালক বালিকার অভিভাবকগণ তাদের পক্ষে যে বিয়ে সম্পন্ন করেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল এবং তার আদৌ কোন কার্যকারিতা নেই।

(খ) বিয়ের বয়স নির্ধারণঃ ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রে তথা ইসলামী আইনে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই, অন্য কথায় বিয়ের বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। বরং এর সাধারণ নির্দেশাবলীর মূলকথা এই যে, যৌবনে পদার্পণ করাই একজন মানুষের সাবালক বা সাবালিকা হওয়া ও সকল কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যৌবনে পদার্পণের নিশ্চয়তা লাভের জন্য মোটামুটি ভাবে ২৫ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব মুসলিম দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন চালু আছে, তাতে সাধারণত পুরুষের জন্য আঠারো ও নারীর জন্য সতেরো বছরকে যৌবন প্রাপ্তির বযস নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনে ১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ ও ১৭ বছর বয়স্কা নারীকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে আদালতে গিয়ে বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানাতে পারবে। আদালত যখন নিশ্চিত হবে যে, আবেদনকারী বা আবেদনকারীনী দৈহিকভাবে বিবাহযোগ্য এবং তার পিতা বা দাদা তাতে সম্মত, কেবল তখনই আদালত তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবে।

বিয়ের বয়সের এই কড়াকড়ির পক্ষে কোন মুসলিম ফিকাহ শাস্ত্রকারের সমর্থন নেই। এটা পাশ্চাত্য আইন থেকে গৃহীত। পাশ্চাত্যবাসীর একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট আছে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক নরনারী যে ঠিক এই বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, তা আমার মনে হয়না। আমাদের সমাজের সাধারণ নৈতিক পরিবেশও এই বয়সের সীমা নির্ধারণের অনুকূল নয়। যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথেই নরনারীর বিয়ে করার অধিকার ও অনুমতি থাকা অপরিহার্য।

২. বয়োপ্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা

আমি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তরুণ-তরুণীদের বিয়ের পক্ষপাতী। কেননা এতে তাদের চরিত্রের নিরাপত্তা অধিকতর নিশ্চিত হয়, তাদের দায়িত্ব জ্ঞান শাণিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর, বিশেষত স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যও তা উপকারী।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, নারীর জীবনে সন্তান জন্ম দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে যে দৈহিক কষ্ট হয়, তা স্ত্রীর

স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে এমন কথা কেউ বলেনি। শরীর ও মন, নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় ডক্টর ভিক্টর বোজো মল্টস এই মতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন:
"এ কথা অকাট্য সত্য যে, নারীর স্বাস্থ্যের গঠনে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উকরণ। আমি এ কথা সমর্থন করি না যে, বেশী সন্তান প্রসব করলে মেয়েদের আয়ু কমে যায়। কেননা আমরা সবাই জানি, এমন বহু মহিলা রয়েছে, যারা প্রচুর সংখ্যক সন্তান জন্ম দিয়েছেন এবং দীর্ঘজীবী হয়েছেন।"

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বড় রকমের বয়সের ব্যবধান থাকা উচিত নয়

যে সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও উচ্চতর সামাজিক লক্ষ্যসমূহের মর্যাদা দেয়, সে সমাজে আইন রচনার কাজ সমাজের প্রাজ্ঞ সদস্যদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। তারা বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে কোন জিনিসকে সুনির্দিষ্ট করা, প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বা বৈধ করতে পারেন।
এ প্রসংগে উল্লেখ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য এবং তার সুমহান সামাজিক লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থেকেছে। আর সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মানসিক শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা নিশ্চিত করা। তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা এবং এমন একটি সৎ সামষ্টিক অবকাঠামো বিনির্মাণে সহযোগিতা করা, যা মানব সমাজকে একটি শক্তিশালী কর্মক্ষম ও সৎ প্রজন্ম উপহার দিতে পারবে।
কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা হয়নি। কেননা এ জিনিসটা সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাজ্ঞবান লোকেরা আপনা থেকেই বুঝে নিতে পারে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে মানুষের ভেতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা অধিক বয়স্কদের মধ্যে এমন লোক প্রচুর রয়েছে, যারা দাম্পত্য দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষমতায়, স্ত্রীকে সুখী করার যোগ্যতায় এবং গৃহকে আনন্দ ও উল্লাসে মাতিয়ে রাখার ব্যাপারে বহু অল্পবয়সী তরুণের চেয়ে অধিক দক্ষ, সফল ও কুশলী।
তবে কিছু কিছু অভিভাবক এমন স্বার্থান্ধ হয়ে থাকেন, যারা স্থায়ী ক্ষতির কথা বিবেচনায় না এনে উপস্থিত লাভকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। আর এই স্বার্থান্ধ চিন্তার ভিত্তিতেই তারা আপন কন্যাদেরকে দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম অথচ বিত্তশালী বৃদ্ধ লোকদের সাথে বিয়ে দেন। একটি যুবতী মেয়েকে এ ধরনের বিয়ে দেয়া প্রকৃত পক্ষে তাকে কবরে পাঠানোর শামিল।

৪. বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের একনায়কত্ব অবাঞ্ছিত

আমাদের মুসলিম সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যে ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, তাতে যুবতী কন্যার স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে মা-বাপের পছন্দ অপছন্দ মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। একদিকে কুমারী যুবতী কন্যা যেমন নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লজ্জা পায়, অপর দিকে তেমনি বিরাজমান সামাজিক পরিবেশও তাকে পিতামাতা ও অভিভাবকদের ইচ্ছায় আপত্তি জানানোর অধিকার দেয় না। অথচ বহু ক্ষেত্রে এই কারণেই বিয়ে ব্যর্থ হয়ে থাকে এবং এর সাথে অনেক হৃদয়বিদারকা ঘটনাও সংযুক্ত হয়।

ইসলামী আইনের কোথাও সুস্পষ্টভাবে এরূপ একনায়কসুলভ ক্ষমতা অভিভাবককে দেয় হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে কোন কোন মাযহাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে বল হয়েছে যে, পিতা তার কুমারী যুবতী কন্যাকে নিজের ইচ্ছামত জোরপূর্বক বিয়ে দিলে পারে, তবে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই কুমারী কন্যার মতামত নেয়া মুস্তাহাব বা বাঞ্ছনীয় ।

৫. বিয়ের শর্তাবলী

বিয়ের চুক্তিতে কোন বিশেষ জিনিসের শর্ত আরোপ করা অনেক সময় স্ত্রীর স্বার্থের অনুকূল হয়ে থাকে। ইসলামী আইনে এ ধরনের শর্ত আরোপের বিরোধী নয় যদি তা সাধারণ জনস্বার্থ, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য- লক্ষ্য ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী না হয়। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সকল মাযহাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তা এই যে, বিয়ের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, এমন যে কোন শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমন এরূপ শর্ত আরোপ করা যে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবেনা বা স্বামী স্ত্রীর খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকবেনা ইত্যাদি। এ ধরনের শর্ত দ্বারা বিয়েই বৈধ হবেনা।

আর যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয় যা দাম্পত্য সম্পর্কের সাথে সংগতিশীল নয়, কুরআন হাদীস দ্বারাও তা সমর্থিত নয় এবং দেশের প্রচলিত রীতির খেলাপ, তবে সে ক্ষেত্রে বিয়ে বৈধ ও শর্ত বাতিল হবে, এমনকি যদি দুই পক্ষ তাতে সম্মত হয় তবুও। যেমন স্ত্রীকে নিয়ে তার পৈতৃক শহর বা গ্রামের বাইরে যাওয়া যাবেনা, আর কোন বিয়ে করা যাবেনা, দেনমোহর দেয়া হবেনা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী খোরপোশ বহন করতে হবে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবেনা, স্ত্রীকে একাকিনী সফর করতে বা অনুরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজের সুযোগ দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক রকমের শর্ত রয়েছে, যা বৈধ, তবে তা কার্যকরী করতে স্বামীকে আইনত বাধ্য করা যায় না, কিন্তু সম্মতি দিয়ে কার্যকরী না করলে স্ত্রী বিয়ে বাতিল করার অধিকারী হবে। যেমন, স্বামী বিদেশে যেতে পারবেনা, চাকুরী করতে পারবেনা, রাজনীতি করতে পারবেনা, নতুন বিয়ে করতে পারবেনা বা পূর্বতন স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে- ইত্যাদি।

এ থেকে বুঝা গেল যে, বিয়ের মূল উদ্দেশ্য নস্যাত না হয় এমন যে কোন শর্ত আরোপ করার এবং প্রয়োজনে শর্ত লংঘন করলে বিয়ে বাতিল করারও স্বাধীনতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বিয়ের কাবিনে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয়া এবং তার অনুমতি ছাড়া নতুন বিয়ে করলে দুই স্ত্রীর একজন তালাক হয়ে যাবে এই মর্মে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শর্ত আরোপ করা হলে এই শর্ত মেনে চলতে স্বামী বাধ্য থাকবে। এ শর্ত কোন অবস্থাতেই বাতিল হবেনা।

চতুর্থ অধ্যায়

বহুবিবাহ ও ইসলাম

পাশ্চাত্যের ঘোরতর ইসলাম বিদ্বেষী, ধর্মবেত্তা, প্রাচ্যবিদ ও সাম্রাজ্যবাদী মহল বহুবিবাহের ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়ে আসছে এটাকে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে নারীর ওপর নির্যাতন, শোষণ ও যৌন নিপীড়ন চালানোর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে থাকে। এই অপপ্রচারে পাশ্চাত্যবাদী যে চরম অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সম্পূর্ণ অসাড় যুক্তির অনুসারী, তা বেশী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।

নিম্নের কয়েকটি তথ্য এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখেঃ

১. ইসলাম বহুবিবাহ প্রথার প্রথম প্রবর্তক নয়। অতীতের প্রায় সকল জাতিতেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক, চৈনিক, ভারতীয়, ককেশীয়, আশেরীয়, মিশরীয় প্রভৃতি সব জাতিতেই বহুবিবাহ চালু ছিল। এই জাতিগুলোর অধিকাংশেই শুধু বহু বিবাহ চালু ছিল তা নয়, বরং তারা এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলতোনা। চীনের 'লেসকী' আইনে তো 'একশো ত্রিশজন' পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। চীনের জনৈক শাসকের স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার ছিল বলে শোনা যায়!

২. ইহুদী ধর্মেও অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। তাওরাতের অনুসারী নবীগণের প্রত্যেকেরই ছিল বহু সংখ্যক স্ত্রী। তাওরাতে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মানের সাত শো স্ত্রী এবং তিনশো দাসী ছিল।

৩. খৃস্টধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকারী কোন সুস্পষ্ট আইন নেই। কেবল উপদেশ ছলে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। এ কথার দ্বারা বড়জোর সাধারণ অবস্থায় এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বুঝা যায়। এ ধরনের কথা ইসলামেও বলা হয়েছে। আমরাও তা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কোথায় আছে যে, কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ে করাই অবৈধ হবে এবং ব্যভিচারে গণ্য হবে?

ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, প্রাচীন খৃষ্টানরা একাধিক বিয়ে করতো। এমনকি প্রাচীনকালের ধর্মযাজকদেরও কারো কারো একাধিক স্ত্রী থাকতো। বিশেষ বিশেষ স্থানে ও জরুরী অবস্থায় একাধিক স্ত্রী বিয়ে করা প্রাচীন খৃষ্টীয় আমলে বৈধ মনে করা হতো।

৪. সমকালীন খৃষ্টধর্ম যে কৃষ্ণ আফ্রিকায় একাধিক বিয়ের প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেটা আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি। আফ্রিকার পৌত্তলিকদের মধ্যে এই প্রথাটি যে একটি সর্বব্যাপী সামাজিক বাস্তবতা, তা দেখতে পেয়ে সেখানে প্রেরিত খৃষ্টান মিশনারীরা বুঝতে পারে যে, একাধিক বিয়ের বিরোধিতা করলে পৌত্তলিকদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা আফ্রিকী খৃষ্টানদের জন্য বহুবিবাহ সীমাহীনভাবে বৈধ করা অপরিহার্য বলে মত ব্যক্ত করে

৫. পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোও দু দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পরে সৃষ্ট বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষে চলে গেছে। কারণ বহুবিবাহ তাদের সমস্যাবলীর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে।

বহুবিবাহের সামাজিক প্রয়োজন

যে সামাজিক প্রয়োজনগুলো মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে, তার সংগ্রাম অনেক। আমরা এখানে শুধু দু'টো অবস্থার উল্লেখ করতে চাই, যার সংঘঠিত হওয়ার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা।

১. স্বাভাবিক অবস্থায় কোথাও পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে। উত্তর ইউরোপের দেশগুলোতে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেও এবং শান্তির সময়েও পুলায় চেয়ে নারীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ফিনল্যান্ডের প্রতি চারটি বা চিন শিশুর একটি পুরুষ এবং অবশিষ্টগুলো স্ত্রী হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বহুবিবাহ সামাজিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

২. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগাদিতে নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী মারা গেলে-
ইউরোপ মাত্র সিকি শতাব্দিতে দুটো বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে কোটি কোটি যুবক মারা যায়। ফলে বিপুল সংখ্যক বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারী স্বামী ও অভিভাবকহারা হয়ে পড়ে। তাদের কর্মসংস্থান হলেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা ও ঘনিষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিলনা। এই পুরুষরা যাতে তাদেরকে বিয়ে করতে অথবা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত হয়, সেই চেষ্টা না করে তাদের গত্যন্তর থাকতোনা।

বস্তুতঃ যুদ্ধবিগ্রহ ও তার ফলে সংঘটিত ক্ষয়ের দরুন পুরুষের যে ঘাটতি দেখা দেয়, তা পূরণের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা। এমনকি

বহুবিবাহের কট্টর বিরোধী স্পেন্সারও পর্যন্ত বলেছেন যে, "যুদ্ধের ফলে বিপুল সংখ্যক পুরুষ মারা গেলে বহুবিবাহ ছাড়া আর কোন উপায়ে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়না।

বহু বিবাহের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা

মানুষকে একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য করে এমন বহু অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ তার কয়েকটি উল্লেখ করছিঃ

১. স্ত্রী বন্ধা হলে এবং স্বামী সন্তান চাইলে,

স্বামীর পক্ষে সন্তান কামনা করায় দোষের কিছু নেই। এটা মানব মনের স্বাভাবিক বাসনা। এরূপ অবস্থায় স্বামীকে দুই কাজের একটি না করে উপায় থাকেনাঃ হয় তার বন্ধ্যা স্ত্রীকে তালাক দেবে, নচেত তার বর্তমানে আরো এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চাইতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ নৈতিকতা ও সৌজন্যবোধের দিক দিয়ে উত্তম ও সম্মানজনক। স্বয়ং বন্ধ্যা স্ত্রীর জন্যও এটা অধিকতর কল্যাণকর।

আমি নিশ্চিত যে, বুদ্ধিমতী ও সম্ভ্রান্ত নারী এ ক্ষেত্রে স্বামীর একাধিক বিয়েকেই অগ্রগণ্য মনে করবে। আমরা তো দেখেছি যে, বহু বন্ধ্যা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সন্তান প্রজনন সক্ষম নতুন স্ত্রীর খোঁজ স্ব উদ্যোগেই করে থাকে।

২. স্ত্রী যদি এমন কোন দীর্ঘস্থায়ী, সংক্রামক বা স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেককারী রোগে আক্রান্ত হয়, যার দরুন স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম হয়, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামনে দুটো বিকল্প থাকেঃ সে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এতে না থাকে কোন সৌজন্যবোধ, না থাকে নৈতিক মূল্যবোধ, আর না থাকে এতদিনের প্রেম ভালোবাসার কোন মূল্য। বরঞ্চ একজন রুগ্ন নারীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া হয় এবং চরম উপেক্ষা ও অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো, সে আর একটি বিয়ে করে পূর্বতন স্ত্রীর স্বামী ও অভিভাবক হিসাবে বহাল থাকতে পারে। তাকে সে স্ত্রীর মত অধিকারও দেবে এবং চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভারও বহন করবে। রুগ্না স্ত্রী ও তার স্বামী উভয়ের জন্যই যে এই শেষোক্ত বিকল্পটিই অধিকতর সম্মানজনক, মহানুভবতার পরিচায়ক ও সুখশান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. স্ত্রী যদি এত বেশী বিরাগভাজন হয় যে, তালাকের পূর্বে দুই পক্ষের শালিশদের সমঝোতা প্রচেষ্টা, প্রথম তালাক, দ্বিতীয় তালাক এবং উভয়ের মধ্যবর্তী ইদ্দতের

বিরতিও সেই বিরাগ নিরসনে সফল হয়না, তখনও স্বামীর সামনে দুইটি মাত্র বিকল্প অবশিষ্ট থাকে। প্রথমতঃ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য এক নারীকে বিয়ে করা, দ্বিতীয়তঃ সকল আইনানুগ অধিকারসহ তাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখা এবং আরেকটি বিয়ে করা, এখানেও দ্বিতীয় বিকল্পটিই যে প্রথমা স্ত্রীর জন্য অধিকতর সম্মানজনক, স্বামীর জন্য অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ, স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমের অবিচলতা ও নৈতিক মহানুভবতার প্রতীক এবং স্ত্রীর বিশেষতঃ বর্ষীয়সী ও একাধিক সন্তানের জননী একজন মহিলার স্বার্থের অধিকতর নিরাপত্তা দানকারী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

৪. স্বামীকে যদি পেশাগত কারণে অধিক সময় প্রবাসে কাটাতে হয় এবং নিজ শহর ছেড়ে অন্যত্র কোন কোন সময় মাসের পর মাস অবস্থান করতে হয়, অথচ সে প্রত্যেক সফরে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে সাথে নিতে সক্ষম হয়না এবং এতদীর্ঘ সময় একাকী থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ হিসাবে তাকে দুটো বিকল্পের সম্মুখীন হতে হয়ঃ কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই স্ত্রীকে ও তার সাথে মিলনের ফলে জন্ম নেয়া সন্তানদেরকে বৈধ সন্তানদের সমান অধিকার না দেয়া, অথবা বৈধভাবে আর একটি বিয়ে করা, নতুন স্ত্রীর সাথে ধর্মীয় নৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার পেট থেকে জন্ম নেয়া সন্তানদেরকে বৈধ, সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

বহু বিবাহের কুফল

বহু বিবাহের সুফলগুলো উল্লেখ করার পর ন্যায়বিচারের দাবী এই যে, বহু বিবাহের কুফলগুলোও উল্লেখ করা উচিত। এই কুফলগুলো নিম্নরূপঃ

১. সবচেয়ে গুরুতর কুফল এই যে, সতিনদের মধ্যে হিংসা, প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের মনোভাব এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, তা দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, সতীনদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি দূর হয়ে যায়।

২. সতিনদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সন্তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে থাকে। সৎ ভাইয়েরা এই পরিবেশে বড় হতে হতে তাদের ভেতরে হিংসা বিদ্বেষও ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে গোটা পরিবারের জন্য কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। আর এই পরিস্থিতির সবচেয়ে খারাপ প্রভাব পড়ে পিতার ওপর। যার পরিণামে পরিবারের সুখশান্তি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

৩. খোরপোশ ও আচার ব্যবহারে ন্যায় বিচার বজায় রাখার জন্য স্বামী যতই আগ্রহী, আন্তরিক ও সচেষ্ট থাকনা কেন, ভালোবাসার ব্যাপারে ন্যায় বিচার করা কোন স্বামীর পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ আল-কুরআনে এ কথা জানিয়েছেন। নতুন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মাত্রারিক্ত ঝোঁক দেখে প্রথমা স্ত্রীর মনে মনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সে তার নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারেনা। অথচ ভালোবাসা ভাগাভাগি করা খুবই কঠিন এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতাও অসহনীয়।

বহু বিবাহ একটা নৈতিক ও মানবিক ব্যবস্থা

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বহুবিবাহ বিশেষত তা যদি ইসলামী বিধিব্যবস্থার আওতাধীন সংঘটিত হয়, তবে তা একাধারে একটা চকমপ্রদ নৈতিক এবং মানবিক ব্যবস্থা। নৈতিক ব্যবস্থা এই জন্য যে, এটা পুরুষের যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন স্থানে অবাধে মেলামেশার পথ রোধ করে। আর প্রথমা স্ত্রীর পর আর মাত্র তিনজন নারীর সাথে বৈবাহিত সম্পর্ক রাখা তার জন্য বৈধ থাকে-এর বেশী নয়।

কোন বেগানা মহিলার সাথে সে গোপনে মিলিত হতে বা গোপন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা। এটা করতে হলে তাকে অন্তত দু'জন সাক্ষীর সামনে বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ও তার ঘোষণা দিতে হবে। এই চুক্তির কথা ঐ মহিলার অভিভাবককে জানাতে ও তাদের সম্মতি নিতে হবে। তারা কোন আপত্তি প্রকাশ না করে এটা নিশ্চিত করতে হবে এবং আধুনিক নিয়মবিধি অনুসারে তা উপযুক্ত কার্যালয়ে রেজিষ্ট্রী করাতে হবে। সেই সাথে অধিকতর মর্যাদা ও আনন্দ লাভের জন্য ওলীমা বা বৌভাত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করে বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিলে আরো উত্তম হয়।

এ ব্যবস্থাটা মানবিক এ জন্য যে, এ দ্বারা একজন পুরুষ এক স্বামীহীন মহিলাকে আশ্রয় দিয়ে সমাজের একটা বোঝা হালকা করে এবং তাকে তার সেই সব স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যাদের মানসম্ভ্রমসহ যাবতীয় অধিকার সংরক্ষিত।

পাশ্চাত্যবাসীর বহুগামীতা নৈতিকও নয়, মানবিকও নয়

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যবাসীর বহুগামীতা ঠিক এর বিপরীত। এজন্য তাদের মধ্যকার জনৈক লেখক তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, তোমাদের সমাজে এমন একজন মানুষও যদি থেকে থাকে তবে আমাকে দেখাও যে, মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় কোন যাজকের কাছে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করবে যে, সে নিজের স্ত্রী ছাড়া জীবনে আর কখনো কোন একজন মহিলার সাথে একটি বারের জন্যও মিলিত হয়নি।

পাশ্চাত্যবাসীর জীবনে এই বহুগামীতা কোন আইনগত বৈধতা ছাড়াই চালু রয়েছে এবং তা আইনরক্ষকদের জ্ঞাতসারেই চালু রয়েছে। এই বহুগামীতা তারা বিয়ে ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সংগিনীদেরকে তারা স্ত্রীর পরিবর্তে বান্ধবী বলে অভিহিত করে থাকে। আর তাদের সংখ্যাও চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং অগণিত। এটা প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়না এবং পরিবারে তা নিয়ে কোন আনন্দোৎসবও হয়না। এটা সংঘটিত হয় গোপনে এবং সবার অজান্তে। এই সীমাহীন অবৈধ সম্পর্ককে বহুবিবাহ নামে অভিহিত না করে, তাকে আইনের দৃষ্টিতে জায়েজ করে নেয়া হয়েছে। অথচ এর পেছনে কোন নৈতিক চেতনা ও মানবিক অনুভূতি নেই। নিরেট যৌন লালসা ও তার জন্য কোন দায়দায়িত্ব বহন না করার মনোবৃত্তিই এও জন্য এককভাবে দায়ী।

এখন এই দুইটির মধ্যে কোনটি অধিকতর নৈতিকতা সম্মত, নারীর জন্য অধিকতা সম্মানজনক, অধিকতর মানবিক ও অধিকতর প্রগতির সহায়ক, তার ফায়সালা করা যে কোন সুস্থ বিবেকের পক্ষে সহজ; ইসলাম, না পাশ্চাত্যের এই লাগামহীন স্বেচ্ছাচার?

ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের অপপ্রচার

পাশ্চাত্যবাসী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহুবিবাহ নিয়ে যে উন্মাত্ত অপপ্রচারণায় মেতে উঠেছে, তাতে এখন পাঠক মাত্রেই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না এবং সংগতভাবেই তাদের কাছে নিম্নের প্রশ্নগুলো তুলতে পারেনঃ

ইসলামকে দোষারোপ করে তারা যে অপপ্রচারের তাণ্ডব তুলেছে, তার পেছনে যে আনে কোন যুক্তি নেই সেটা কি তারা অনুধাবন করবেনা?

ব্যভিচারের আধিক্যহেতু পরিবারগুলোর ভেঙ্গে পড়া ও অবৈধ সন্তানদের ব্যাপক প্রসারের দৃশ্য দেখেও কি তারা অনুভব ও স্বীকার করবেনা যে, এক স্ত্রী তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

যে ব্যক্তি চার বিয়ে করে, সে যে প্রতি রাত্রে একজন নতুন উপপতীর বাসরে মিলিত হওয়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, তা কি তাদের বিবেক মেনে নেয়না?

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহন করে মিলিত হয়, সে যে তার কোন দায়দায়িত্ব বহন না করে তার মাতৃত্ব হরণকারীর চেয়ে ভদ্র ও মহৎ তা তারা কোন কারণে স্বীকার করবেনা?

তারা কি এই সহজ সত্যটুকুও বোঝেনা যে, সমাজে ফি বছর লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্ম গ্রহণের চাইতে একই সংখ্যক বা তার চেয়ে কমবেশী বৈধ সন্তান জন্ম নেয়া অনেক ভালো ও সম্মানজনক?

আমার ধারণা এইযে, তারা যদি ইসলামের প্রতি তাদের আজন্ম লালিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং নিজেদের সবকিছুকে নির্বিচারে ভালো ও অন্যদের সব কিছুকে নির্বিচারে খারাপ মনে করার নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করে, তাহলে তারা উল্লেখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবেই অনুধাবন করতে পারবে

আমি বললামঃ তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ, সুলায়মান এবং হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে সকল ইসরাইলী নবী, যারা একাধিক বিয়ে করেছেন, তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

এ প্রশ্নে তিনি সম্পূর্ণ নীরব রইলেন এবং কোনই জবাব দিতে পারলেন না।

পবিত্র আল কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি

পবিত্র আল কুরআনে সূরা আন নিসার প্রথম দিকে আল্লাহ বলেনঃ "যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, তাহলে দুটো করে, তিনটে করে ও চারটে করে বিয়ে কর। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে মাত্র একটিই বিয়ে কর অথবা দাসী রাখ। স্বয়ং রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় সাধারণ মুসলমান ও সাহাবীগণ এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ীগণ ও ইজতিহাদ যুগের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ এ দুটি আয়াতের যে অর্থ বুঝেছেন, সে অনুসারে আয়াত দুটি থেকে নিম্নোক্ত বিধিসমূহ জানা যায়ঃ

১. চারটি পর্যন্ত একাধিক বিয়ের দ্ব্যর্থহীন অনুমতি। এখানে "বিয়ে কর" কথাটা আদেশবাচক হলেও এর অর্থ এটা নয় যে, একাধিক বিয়ে করতেই হবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো "বিয়ে করতে পার"।

২. একাধিক বিয়ে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচারের শর্তাধীন। যে ব্যক্তি নিশ্চিত নয় যে, সে তার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে তার পক্ষে একাধিক বিয়ে করা গুনাহ। এতদসত্ত্বেও কেউ চারটে পর্যন্ত বিয়ে করলে বিয়ে তো বৈধ হবে। কিন্তু সে গুনাহগার হবে।

৩. প্রথম আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সম্ভাব্য সন্তানদের ভরণপোষণের সামর্থ থাকাও দ্বিতীয় বিয়ের অন্যতম শর্ত।

রাসূল (সা) এ আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্ত্রীদের প্রতি সুবিচার সম্মত আচরণ করার পর বলতেনঃ "হে আল্লাহ, যে বিষয়ে সুবিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব সে ব্যাপারে যতটুকু পারি সুবিচার করলাম। আর যে বিষয়ে সুবিচার করা আমার অসাধ্য সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন না।"

ভ্রান্ত ধারণা

আল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ এরূপ ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, আল কুরআন প্রথম দুটি আয়াতে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা প্রথম আয়াতে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় বিচারের শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার কখনো সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা একাধিক বিয়ের জন্য একটা অসম্ভব জিনিসের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ।

সামান্য একটু বিচার বিবেচনা দ্বারাই এই দাবীর ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ যে ন্যায়বিচারের শর্ত প্রথম আয়াতে আরোপ করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত অসম্ভব ন্যায় বিচার নয়। প্রথম আয়াতে যে ন্যায় বিচারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই ন্যায়বিচার, যা স্বামীর পক্ষে করা সম্ভব। এ ন্যায়বিচার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, রাত্রিযাপন প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুগত ন্যায়বিচার।

আর যে ন্যায়বিচারকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা হচ্ছে স্বামীর পক্ষে যা বাস্তবিক পক্ষেই সম্ভব নয় সেই ন্যায়বিচার। এটি হলো ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সংক্রান্ত মনস্তাত্বিক ন্যায়বিচার। এটা সুনিশ্চিত ব্যাপার যে, প্রথমা স্ত্রীর প্রতি কোন না কোন কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ দ্বিতীয় বিয়ে করেনা। কাজেই প্রথমা স্ত্রীর সাথে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার ব্যাপারে ন্যায় বিচার সে কিভাবে করতে পারে?

পঞ্চম অধ্যায়

তালাক প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ তালাকের বিধি চালু করেছেন স্বামীস্ত্রীর অবনিবনার শেষ প্রতিকার হিসাবে।

সকল আপোষ প্রচেষ্টা যখন নিষ্ফল প্রমাণিত হবে, কেবল তখনই প্রয়োগ করার জন্য তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ শত শত বছর ধরে পশ্চিমারা এই তালাক ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইসলামকে দোষারোপ করে যাচ্ছে এবং এটিকে ইসলাম কর্তৃক নারীর অবমাননা ও বিয়ের পবিত্রতা বিনাশের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে চলেছে।

বিধানেও এর ব্যবস্থা ছিল এবং পৃথিবীতে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই এ ব্যবস্থা সুপরিচিত এ কথাও সত্য যে, ইসলাম তালাক ব্যবস্থা প্রথম প্রচলন করেনি বরং ইহুদী ধর্মীয় ছিল। ইসলাম সামাজিক সংস্কারের যত পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে যেমন সব সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার ও সম্মানের নিশ্চয়তা বিধান করেছে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও স্বামী স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও সম্মানকে নিরাপদ করেছে। পাশ্চাত্যবাসী তালাক বৈধ করতে গিয়ে যেমনটি করেছে, ইসলাম তেমনভাবে তালাককে বিয়ের পবিত্রতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এবং দাম্পত্য জীবনকে স্থিতিহীন করার হাতিয়ারে পরিণত করেনি। তালাকের ক্ষেত্রে পালিত নীতিমালা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য কলহ নিরসনে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেঃ

১. স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে সে একে অপরের প্রতি ও সন্তানাদির প্রতি দায়িত্ব সচেতন হবার আহবান জানায় এবং এ ব্যাপারে সে যে স্বয়ং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য, তার উপলব্ধি করতে বলে। কেননা তারা সদাচরণ করলে বা অসদাচরণ করলে উভয় অবস্থা আল্লাহ তাদের ব্যাপারে অবহিত। উভয়কে তিনি পরিবার সম্পর্কে দায়িত্বশীল ও পরিবারের ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে রাসূল তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। সহীহ আল বুখারী (সা) বলেছেনঃ "তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক যাদের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব তোমাদের অর্জন করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারীও তার স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

২. যখন উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন ইসলাম উভয়কে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়, বিশেষতঃ একজন অন্যজনের যা কিছু অপছন্দ করে তার প্রতি ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়। কেনন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, মেজাজমর্জী ও স্বভাব চরিত্র সমান বানানো হয়নি। তাই মানুষ যা পছন্দ করেনা, তা দেখেও না দেখার ভান করা ছাড়া উপায় থাকেনা। বিশেষতঃ অনেক সময় মানুষ যা অপছন্দ করে তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত থাকে। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। তাদেরকে যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে মনে রেখ, এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমরা অপছন্দ করে থাক, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা আন নিসা ১৯)

৩. কিন্তু এরপরও যখন দেখা যায় যে, একে অপরকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, পরস্পরের মতবিরোধ কেউ সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে পারছেনা এবং উভয়ের মতবিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন ইসলাম এই মতবিরোধ মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করে উভয়ের আত্মীয় স্বজনের ওপর। স্বামী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে এবং স্ত্রী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে এবং উভয়ে পারিবারিক আদালত বা শালিশী আদালত হিসাবে কাজ করবে। তারা মতবিরোধের কারণগুলো খতিয়ে দেখবে এবং তা মিটিয়ে ফেলে সমঝোতা ও আপোষ রফার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি মতবিরোধ নিরসন ও আগের মত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ফিরে আসুক এটা কামনা করে, তাহলে উভয় শালিশ তাদের কাজে অবশ্যই সফল হবে। এ কথাই আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছেঃ "তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ শত্রুতায় পরিণত হবার আশংকা কর, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন শালিশ পাঠাও। তারা দু'জনে পরিস্থিতির সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন। (সূরা আন নিসা ২৫)

৪. এই শালিশীও যদি ব্যর্থ হয় এবং উভয়ে নিজ নিজ মতের উপর জিদ ধরে, তাহলে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি মাত্র তালাক প্রয়োগের অনুমতি দেয়, তাও এই শর্তে যে, স্ত্রী স্বামী গৃহে থেকেই তিন মাসের কাছাকাছি মিয়াদী ইদ্দত পালন করবে, কেবল স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক দাম্পত্য আচরণ স্থগিত থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ফিকাহর কিতাবে পাওয়া যাবে। স্বামী গৃহে ইদ্দত পালনের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে আগের মত সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়া ছাড়া কিছু নয়।

উভয়ের উত্তেজনা যখন প্রশমিত হবে এবং নিজেদের ও সন্তানদের জীবনে তাদের বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতি তারা দেখতে পাবে, তখন হয়তো উভয়ে জিদ ও হটকারিতা ত্যাগ এবং বিতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে দাম্পত্য জীবনের সাবেক সুখশান্তি ও ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনতে রাযী হয়ে যাবে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলাম একটা অনিবার্য ব্যবস্থা হিসাবে তালাকের অনুমতি দিলেও তালাককে যে সে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ও গর্হিত জিনিস মনে করে, সে কথা হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ "হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস হচ্ছে তালাক।"

তাছাড়া প্রাথমিকভাবে যে তালাকটি স্বামী দেয়, তা তালাকে রজয়ী বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং স্ত্রীর ইদ্দত যতদিন থাকে ততদিন তা প্রত্যাহারযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করতে কোন মোহর, স্বাক্ষী ও আব্দ তথা পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবেনা। তালাকের প্রভাব খতম করার জন্য যে কোন মুহূর্তে তারা দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করে নিলেই পারে। কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সাবেক দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে, স্ত্রীকে শুনিয়ে বলতে হবেঃ আমি তোমার তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। এতেই সে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবে।

৫. ইদ্দতকালে স্বামী তালাক প্রত্যাহার না করলে তালাক বায়েনে পরিণত হবে। অর্থাৎ এক্ষণে স্বামী নতুনভাবে দেন মোহর নির্দ্ধারণ করে নতুন আব্দ করে বিয়ে করা ছাড়া তার কাছে আসতে পারবেনা। এ সময়ে স্ত্রী যদি তার কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করতে চায় তবে প্রাক্তন স্বামী তাকে তার কাছে ফিরে আসার জন্য এবং দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ দিতে বা বাধ্য করতে পারেনা।

৬. স্বামী স্ত্রী যখন সাবেক দাম্পত্য জীবনে ফিরে যায়, তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হোক বা ইদ্দতের পরেই হোক, এবং এরপর পুনরায় তাদের মধ্যে অবনিবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে আমরা (যারা এই পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট) পুনরায় অবিকল পূর্বোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর পুনরাবৃত্তি করবো। অর্থাৎ উভয়কে পরস্পরের সাথে সদব্যবহার করার উপদেশ দেবো, একজনকে অপরজনের অপছন্দনীয় আচরণ সহ্য করতে বলবো, কিন্তু বিরোধ বেড়ে গেলে পারিবারিক শালিশীর সাহায্য নেবো, এবং এতেও নিষ্পত্তি না হলে

স্বামী দ্বিতীয় তালাক দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম তালাকের বেলায় অনুসৃত যাবতীয় বিধি প্রযোজ্য হবে।

৭. দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি স্বামী স্ত্রী পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে যায় এবং আবার অবনিবনা দেখা দেয়, তবে আবারো তালাকের পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পুনরাবৃত্তি কর হবে। এ সব পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তৃতীয় ও চূড়ান্ত তালাক দেয়া বৈংধ হবে। এবারের তালাকে উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এরপর উভয়ের পুনর্বিবাহ কেবল তখনই সম্ভব, যখন স্ত্রীর ইদ্দতের পর অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিরোধ বাধবে ও তালাক সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাওয়া ও ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়া বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে হতে হবে এবং এর কোন পর্যায়েই কোন কূটকৌশল বা চাপ প্রয়োগ করা চলবেনা।

তালাকের ক্ষমতা এককভাবে স্বামীর হাতে রাখার কারণ

তালাক সম্পর্কে যে প্রশ্নটি সচরাচর করা হয়, তা প্রধানত এমন লোকদের সৃষ্টি, যারা ইসলামের প্রতি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল নয়। সেই প্রশ্নটি হলোঃ শুধু পুরুষের কর্তৃত্বে তালাকের ক্ষমতা সমর্পিত হলো কেন এবং যখন ইচ্ছা, বিয়ে ভেংগে দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হলো কেন? যে স্ত্রী এখনো তার জীবন সংগিনী হিসাবে বহাল আছে, তার মতামত দেওয়ার সুযোগ রাখা হলোনা কেন? বিশেষত প্রচণ্ড ক্রোধ বা ঝগড়ার পরেও যখন এমন ঘটনা ঘটে থাকে।

এ ব্যাপারে পাঁচটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল-

১.তালাকের ক্ষমতা শুধু স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা।

২. উভয়ের ঐক্যমতের ওপর ছেড়ে দেয়া

৩. আদালতের মাধ্যমে তালাক প্রয়োগের ব্যবস্থা

৪. এককভাবে পুরুষের হাতে অর্পণ করা

৫. পুরুষের হাতে অর্পণ করা, তবে তার পাশাপাশি স্বামী ক্ষমতার অপব্যবহার করলে স্ত্রীকেও তালাক প্রয়োগের সুযোগ দেয়া।

এক্ষণে এই ব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে দেখা যাক।

১. এককভাবে স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা দেয়ার কোনই যৌক্তিকতা নেই। কেননা এতে স্বামীর আর্থিক ক্ষতি ও পরিবারের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে। স্ত্রী তালাক দ্বারা আর্থিকভাবে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। সে নতুন করে দেনমোহর পায়, নতুন ঘর

পায় ও নতুন স্বামী পায়। ক্ষয়ক্ষতি যা হবার, তা কেবল স্বামীরই হয়। স্ত্রীকে তার মোহরানা দিতে হয়, গৃহ ও সন্তানের খরচ বহন করতে হয়।

২. স্বামী স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যের ওপর ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেয়াও অযৌক্তিক। উভয়ের ব্যাপারে একমত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। স্বামী স্ত্রী উভয়ে তালাকের সমঝোতায় উপনীত হলে ইসলাম তাতে আপত্তি করেনা। কিন্তু এই সমঝোতার ওপর এর বৈধতাকে ঝুলন্ত রাখতে পারেনা।

৩. আদালতের মাধ্যমে তালাকের প্রথা পাশ্চাত্যে চালু থাকলেও তাতে তেমন কোন ফায়দাও হচ্ছেনা এবং তার ক্ষতির দিকগুলোও প্রমাণিত হয়ে গেছে। ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম দিক হচ্ছে আদালতের সামনে, এবং দুই পক্ষের উকীল ও সমর্থকদের সামনে দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয়গুলো ফাঁস হয়ে যাওয়া। এ সব গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ায় উভয় পক্ষের জন্য শুধু বিব্রতকর নয়, ঘোর অকল্যাণের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ধরা যাক, কোন স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, আর এ কারণে আদালতে তালাকের আবেদন জানায়। তাহলে এ ব্যাপারে কত লজ্জাকর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর এ সব ব্যাপার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়শীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে পত্রপত্রিকা তো তাদের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে।

আর এ দ্বারা কোন ফায়দার আশাও যে নেই, তা পাশ্চাত্য জগতেই ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আদালত এ সব ব্যাপারে নেহাত নামকা ওয়াস্তে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

স্বামী নিখোঁজ হলে

স্বামী যদি একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে তার স্ত্রীর কী গতি হবে?

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে স্বামী ফিরে আসা কিংবা আদালতে তার মৃত্যুর রায় দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে তার নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। তবে আদালত কখন তার মৃত্যুর পক্ষে রায় দেবে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মযহাবের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত এই যে, তার সমবয়সীদের মধ্য থেকে যিনি প্রবীণতম, তার মৃত্যু হলেই আদালত স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে বলে রায় দেবে। অন্যরা বলেন, তার বয়স আশি বছর হওয়ার পর আদালত তার মৃত্যুর পক্ষে রায় দেবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে সর্বোচ্চ চার বছর পর ঐ স্বামী থেকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। এই দুই মযহাবের কেউ কেউ আবার সর্বোচ্চ তিন বছর, এক বছর ও ছয় মাস মেয়াদ নির্ধারণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মত গ্রহণ করলে স্ত্রীর বিরাট ক্ষতি ও কষ্ট অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা তাকে স্বামীর আশি বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর ইদ্দত পালন করতে হবে এবং তারপর অন্য পুরুষের সাথে তার বিয়ে বৈধ হবে। প্রশ্ন এই যে, এর পর তাকে কে বিয়ে করবে? আর এত দীর্ঘকাল তাকে ধৈর্য ধারণ করতে ও একাকীনী জীবন যাপন করতে আমরা বাধ্য করবো কিসের ভিত্তিতে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতানুসারে আদালত তার স্বামীর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করার আগে হয়তো বা স্ত্রীর মৃত্যুই ঘটে যাবে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের রায় গ্রহণ করাই স্ত্রীর জন্য সহজতর ও নিরাপদতর। তাই তিন বছরের বেশী কোন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া নিখোঁজ থাকা কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করা স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

যদিও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছিল, তথাপি ইসলামের প্রথম যুগে রাজনীতির সাথে তাদের কোন সংযোগ ছিলনা। রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের পর বনু সায়েদা গোত্রের মুক্তাঙ্গনে মুসলমানদের খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত সলাপরামর্শের জন্য সাহাবীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কোন নারী যোগদান করেছিল বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের এটাও জানা নেই যে, নারীরা শাসন সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সাথে অংশ নিত। খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে পরামর্শের জন্য পুরুষদের যেমন বৈঠক আহবান করতেন, তেমনি নারীদেরও বৈঠক অনুষ্ঠিত করতেন-এমন কোন তথ্য আমাদের গোচরে আসেনি। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসেও আমরা এর কোন নজীর দেখতে পাইনা যে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক তৎপরতায় ও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনায় নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অবস্থান করতো।

সমগ্র ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে আমরা যেটুকু পাই তা হচ্ছে, রাসূল (সা) নারীদের হাতে হাত না রেখেই অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, সন্তান হত্যা করবেনা, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবেনা এবং রাসূল (সা) এর কোন ন্যায়সংগত আদেশ লংঘন করবেনা। এ অংগীকার গ্রহণ করা হয় মক্কা বিজয়ের দিনে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও একই অংগীকার গ্রহণ করা হয়।

এই অংগীকার গ্রহণের ঘটনাটাকে কেউ যদি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা হিসাবে গণ্য করে, তবে সে ভুল করবে এবং একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যাবেনা।

আমরা এ কথা জানি যে, কোন কোন সাহাবীর স্ত্রী রাসূল (সা) পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহে আহতদের সশ্রুষা ও পিপাসার্তদের পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের সাথে রণাংগনে চলে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা ও সেবাসুশ্রুষার জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকতেন এবং কোন মুসলমান যুদ্ধে আহত হলে রাসূল (সা) তাকে ঐ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এ তথ্যটাও নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ

বহন করে না। এটা কেবল নারীর রণাঙ্গনে সেবাসুশ্রুষা ও পানি খাওয়ানো এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধেও লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এ সব ব্যাপারে নারীর এখনো জড়িত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

আমরা এ কথাও বিলক্ষণ জানি যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকালে মুসলিম নারীর অবদান ও ত্যাগ তিতিক্ষা অসাধারণ ও বিপুল। হযরত উমরের বোন ও হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা প্রমুখের দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে নারীর বিপুল প্রভাব রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অবদান রাখা তাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য এখনো বহাল রয়েছে। তবে এ যুগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে যা বুঝা যায়, তাতে অংশ গ্রহণের বৈধতা এ দ্বারা দাবী করে। আমরা এও জানি যে, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে রাসূলের (সা) ঈদের খুতবা ও ওয়াজ শুনতে সমবেত হতো। কিন্তু এ দ্বারা তাদের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ প্রমাণিত হয়না। যারা এরূপ দাবী করে, তারা ভুল ইতিহাসের এক বিখ্যাত যুদ্ধ-উষ্ট্রযুদ্ধে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উটের পিঠে বসে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পরবর্তীতে হযরত আয়েশা নিজের এই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছিলেন এবং অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনগণ এ জন্য তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন। কেননা রাসূলের (সা) স্ত্রী হিসাবে নিজগৃহ থেকে বের হওয়া যে তাঁর জন্য বৈধ ছিলনা, সেটা কুরআনের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞার অন্যরকম ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা ভুল ছিল এবং সে জন্য তিনি তওবা করেন "ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। যুদ্ধের পর হযরত আলী তাঁকে সসম্মানে ও পূর্ণ নিরাপত্তাসহকারে মদীনায় তাঁর গৃহে পৌছিয়ে দেন। কাজেই হযরত আয়েশার এই পদক্ষেপ দ্বারা মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়না।

কেননা এটা একেতো একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা। উপরন্তু এটা যে ভুল ছিল, সেটা খোদ হযরত আয়েশাই উপলব্ধি করেছিলেন।

ইতিহাসের কোন কোন যুগে কোন কোন নারী যে দেশের শাসক ও সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন এবং কেউবা নিজের স্বামীর ওপর প্রভাব খাটিয়ে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশীদার হয়েছিলেন, যেমন হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা, সেটাও আমাদের জানা। কিন্তু এ সবই

ব্যতিক্রমী ও ব্যক্তিগত ঘটনা। তারা কেবল তাদের স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমেই শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। আজকের যুগের প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর অংশ নিতেন না।

সুতরাং এ কথা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম নারীরা অতীতে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করতো না এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীতেও তারা কোনই ভূমিকা পালন করেনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এর কারণ কী? আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, ইসলাম নারীর মর্যাদা বাড়িয়েছে, আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে পুরুষের সমান বানিয়েছে এবং তাদের জীবনের সকল ক্ষতি ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়েছে। এখানে ইসলামের ভূমিকাটা দৃশ্যত একটা স্ববিরোধী মনে হয়। তাই এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের যুগে নারী ও রাজনীতি

পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম নারী এখন আর আগের মত স্বামী ও সন্তানদের পরিচর্যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এখন সে তার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মতের সমর্থকবৃন্দ এই মর্মে দাবী জানাতে আরম্ভ করেছে যে, পুরুষের মত তারও রাজনৈতিক অধিকার থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত, সিরিয়াসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার ও সংসদ সদস্য হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

যাহোক মুসলিম নারী যে ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার পেয়েছে, সেটা এখন একটা বাস্তব সত্য। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী, সেটাই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

ভোটাধিকার

অনেক চিন্তাগবেষণা ও পর্যালোচনার পর দেখা গেছে যে, ইসলাম নারীকে ভোটাধিকার প্রদানে বাধা দেয়না। নির্বাচন হচ্ছে জনগণ কর্তৃক এমন কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করার নাম, যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও সরকারের তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং নির্বাচন বা ভোেট দান মূলত প্রতিনিধি নিয়োগ করার নাম। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের পসন্দসই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই প্রতিনিধিরা প্রতিনিধি পরিষদে গিয়ে তাদের ভোটারদের পক্ষে কথা বলে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে। নারী যদি কোন ব্যক্তির ওপর তার অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চায় এবং সমাজের একজন সদস্যা হিসাবে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা প্রদান করতে চায়, তবে নারীর এ কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

তবে নারীতে ভোটাধিকার প্রদানের একমাত্র শর্ত হলো, ভোট দেয়ার সময় তাকে পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে না হয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ যে কাজ হারাম করেছেন, সেটা সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। যেসব মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার চালু হয়েছে, সেখানে মহিলা ভোটারদের জন্য আলাদা ভোট কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এই শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলারা সেখানে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বাড়ীতে ফিরে আসে এবং পর্দার বিধান ভংগ করে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে বা কোন হারাম কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়না।

জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার

ইসলামের নীতিমালায় নারীর ভোটাধিকার যখন স্বীকৃত, তখন তার জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকারও স্বীকৃত কিনা, সেটা এবার বিবেচনা করে দেখা যাক।

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগে জনপ্রতিনিধিত্বের ধারণাটা কী, তা আমাদের জানা দরকার। জনপ্রতিনিধিদের সাধারণত দুটো কাজ করতে হয়:

১. আইন ও বিধিমালা রচনা করা।

২. সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করা।

আইন রচনার কাজ থেকে নারীকে নিবৃত্ত করার কোন কারণ ইসলামে নেই। কেননা আইন রচনায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান- এই উভয়বিধ জ্ঞানই এর আওতাভুক্ত। ইসলামে জ্ঞানার্জনে নারী ও পুরুষকে শুধু সমান অধিকারই দেয়না, বরং জ্ঞানার্জনকে উভয়ের জন্য ফরয বলে ঘোষণা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু বিদুষী মহিলা রয়েছেন, যারা হাদীস, ফেকাহ ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

সপ্তম অধ্যায় নারীর সামাজিক অধিকার

শিক্ষার অধিকার

মুসলিম সমাজে সাম্প্রতিককালে নারীরা সাধারণভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতো। অথচ ইসলাম শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কুরআন ও হাদীসের কোথাও একটি উক্তিও এমন নেই, যা নারীর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে বা নিরুৎসাহিত করে। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ইতিহাসে শত শত খ্যাতনাম্নী বিদুষী, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস ইত্যাদি ছিলেন এবং তাদের জীবনীও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই মুহূর্তে একজনের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করতে চাই। ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ, তোহফাতুল ফুকাহা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দীন সামারকান্দীর (মৃত সন ৫৩৯ হিঃ) কন্যা ফাতিমা। ইনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তাঁর পিতার সুযোগ্য শিষ্য, বিশ্ববিশ্রুত ফিকাহগ্রন্থ 'আল বাদায়ে ওয়াল্-সানায়ে' এর রচয়িতা আল্লামা আলাউদ্দীন আল কাসানীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। (কাসানীর ইন্তিকাল হয় ৫৮৭ হিজরীতে) তাঁর রচিত এই বিশালকায় গ্রন্থ আসলে তাঁর উস্তাদ ও শ্বশুর আল্লামা সামারকান্দীর তোহফারই সম্প্রসারিত ও বিস্তারিত রূপ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, 'তিনি তাঁর পুস্তকের ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করলেন।' ফাতিমা এতই অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন যে, তাঁর স্বামী ভুল করলে তিনি তা শুধরে দিতেন। তাঁর পিতার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে পিতা যে ফতোয়া দিতেন, তাতে পিতা ও কন্যা উভয়ের মতামত থাকতো। অতঃপর বাদায়ের লেখকের সাথে বিয়ে হলে ফতোয়ায় তিনজনের রায় থাকতো। পিতার, কন্যার ও জামাতার।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক যুগে মুসলিম নারীদের নিরক্ষরতা মুসলিম জাতির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষিতা মা ও শিক্ষিতা স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে খুবই সহায়ক হবে।

তবে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য একই পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা মারাত্মক ভুল। কেননা শিক্ষা জীবনের পরবর্তী জীবনে একজন পুরুষের যা প্রয়োজন, নারীর তার প্রয়োজন নেই। কেননা নারী জন্মগতভাবে স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্য। তাই তার পরবর্তী জীবনে যা যা উপকারী, সেটাই তার শেখা কর্তব্য। দেশে দেশে আজ নারীদের উপযোগী অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরো হওয়া দরকার। বিশেষভাবে

পরিবার পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচীতে বেশী পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যত জীবনে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়।

চাকুরীর অধিকার

আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নারীর জন্য যে জিনিসটি নিষিদ্ধ করেছে তা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ। এর কারণও যথা স্থানে বিশ্লেষণ করেছি। এ কথাও বলেছি যে, রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব যে সব পদে রয়েছে তাও একইভাবে নারীর জন্য নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য যত চাকুরী আছে, সেগুলোর জন্য যোগ্যতায়ও তার কমতি নেই এবং ইসলামেও নিষিদ্ধ নয়। তবে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে তার সামঞ্জস্য ও সংগতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রী হিসাবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, চাকুরীটা কোন ক্রমেই এমন হতে পারবেনা। তাছাড়া চাকুরীরত মহিলা তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা এবং শরীরের নিষিদ্ধ স্থানগুলো তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবেনা। একই কক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে কাজ করতে পারবেনা। কেননা ভিন্ন পুরুষের সাথে নিভৃত সাক্ষাত শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একই কক্ষে কাজ করলে সেই নিষিদ্ধ নিভৃত সাক্ষাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় পুরোপুরি মহিলা কর্মচারীদের দখলে। আপনি সেই সব প্রতিষ্ঠানে অফিসের সময় শেষে দরজার কাছে দাঁড়ালে মহিলা কর্মচারীদের দলে দলে বেরুবার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারবেননা।

কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অফিস আদালতে মহিলাদের চাকুরির সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের চোখে প্রগতিবাদী সেজে তাদেরকে খুশী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। আসলে এটা অতিমাত্রায় সরলতা ও পাশ্চাত্যমুখী মানসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি জাতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্মান ও মর্যাদা লাভ কোন ভাবেই অফিস আদালতের চাকুরী থেকে পুরুষদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তদস্থলে নারীদেরকে নিয়োগ করার ওপর নির্ভশীল নয়। ওটা নির্ভর করে শুধু ঐ জাতির বুদ্ধি ও মেধার ভিন্নতার, কর্মক্ষমতা ও কর্মমুখিতা, উচ্চাভিলাস এবং শক্তিমত্তার ওপর। দেশের তাবত অফিস আদালতে মহিলাদেরকে চাকুরী দিলেই এই সব জিনিস অর্জিত হয়ে যাবে কি?

হা, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যা মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে, যেমন হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড, নারীরাই অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারে। এ কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে অনুরোধ করবো, মেয়েদের চাকুরির সুযোগ পাইকারিভাবে উন্মুক্ত করবেন না, বরং যে সব কাজে হয় নারীরা ছাড়া কেউ সফলই হয়না, অথবা পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিকতর সফল হয়, সেই সব কাজে উন্মুক্ত করুন। এটা একটা বিশাল কর্মক্ষেত্র, যেখানে মহিলাদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি।

ইসলামের বিধিবিধান জানে এমন কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেনা যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা যে সব চুক্তি ও কর্ম সম্পাদন করে, তা শুদ্ধ ও কার্যকর এবং এগুলো কোন অভিভাবক বা স্বামীর অনুমিত সাপেক্ষে নয়। আমরা এ বিষয়টি শুরুতেই পরিস্কার করে বলে এসেছি।

সপ্তম অধ্যায়

নারী স্বাধীনতার ধুয়া

নারীর সমস্যা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম এবং মিথ্যা ও ভাওতাবাজীই বেশী। মুসলিম সমাজের নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই। ইসলামই তাদেরকে স্বাধীন করেছে। এ সমস্যা পাশ্চাত্যবাসীর। এ সমস্যা তাদের কোনদিনই ঘুচবেনা। নারীর কাছে ইসলাম যে লজ্জা, শালীনতা, বিনয় এবং তার বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুবিধার্থে তার যে একাগ্রতা ও গৃহমুখীনতার দাবী জানায়, সেটা তার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করা ও দমন করার জন্য নয়, বরং সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার জন্য। কোন জিনিসকে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার অর্থ তাকে দমন করা ও ধ্বংস করাও নয়, বরং এর অর্থ হলো তাকে তার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে তার সীমা লংঘন থেকে বিরত রাখা। এ দ্বারা তাকে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা হয় এবং পরিবার ও সমাজের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। আমরা সবাই এ কথা ভালো করেই জানি যে, 'দমন করা' ও শৃংখলা রক্ষা করার মধ্যে ঠিক ততটাই ব্যবধান, যতটা ব্যবধান 'ভাংগা' ও 'গড়ার' মধ্যে এবং 'আইনানুগতা' ও 'অরাজকতার' মধ্যে।'

নারীবাদী স্লোগানগুলোর সারকথা অনেকটা এরকম:

১. পুরুষকে বিশ্বাস করা যাবে না কখনোই। নির্ভরশীল হওয়া যাবে না তাদের ওপর, বরং নারীকেই হতে হবে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। সবখানে, সবকিছুতে পুরুষের সাথে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: নারীবাদী একটি স্লোগান-"নারীর কোনো দেশ নাই" (মানে সবাই নারীর বিপক্ষে; তাকে টিকে থাকতে হবে নিজের যোগ্যতায়।)

২. নারীর জন্য উচিত নয় কোনো পুরুষের পেছনে তার শক্তি-সামর্থ্য কিংবা আয়-উপার্জন খরচ করা।। তার উপার্জনের একমাত্র ভোক্তা হবে সে নিজে এবং নারীজাতি।

৪. নারীর ওপর কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। সে কারও দুয়ারে ধরনা দেবে না। স্বামী-বাবা-ভাই কিংবা সন্তান-কাউকেই তার প্রয়োজন নেই!

৫. আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারাতেই নারীর আসল সম্মান। নারীর খরচের দায় যখন অন্য কেউ মেটাবে, সে তখন তার সম্মান হারাবে। পরিণত হবে অপরের দাসীতে। কাজেই, নারীকে টাকা-পয়সার দিক দিয়ে স্বাধীন হতে হবে।

অবশ্য বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন কিছু নারী এসব স্লোগানে আপত্তি তোলে। তাদের প্রশ্ন:

১. আর্থিক বিচারেই যদি নারীকে মূল্যায়ন করা হয়, তবে সন্তান লালন-পালন করবে কে?

২. স্বামীর সাথে নারীর সম্পর্কটা যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতারই হয়, তবে পরিবার পরিচালনা করবে কে? পরিবার চলবে কার কথায়? তখন তো পুরো পারিবারিক কাঠামোই ভেঙে পড়বে!

ফেমিনিস্টদের পক্ষ থেকে এর জবাব আসে- "সন্তান! পরিবার! ঘর সামলানো। চুলোয় যাক ওসব। এসব মুখরোচক শব্দের আড়ালে তোমরা নারীদেরকে নব্য-দাসত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। আমরা বলব-আমার শরীর, আমার স্বপ্ন আর আমার জাতি ছাড়া কারও জন্যই আমি কাজ করতে রাজি নই।

এভাবেই পারিবারিক কাঠামোর পক্ষে আসা আওয়াজগুলো থামিয়ে দেওয়া হয়। 'নারী-স্বাধীনতা-বিরোধী' এমনকি 'নারীবিদ্বেষী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। "নারীকে পুনরায় সেই দাসত্ব ও নিপীড়নের রাজ্যে ফিরিয়ে নিতে চায়"-এমনটা বলে ট্যাগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে নারীবাদী বয়ানগুলোকে আরও উচ্চশব্দে, আরও জোর দিয়ে প্রচার করা হয়-যাতে করে নারীরা অবচেতনেই নারীবাদী সব অ্যাজেন্ডাকে সঠিক, যুক্তিসম্মত ও 'নারীর পক্ষে' বলে মনে করতে শুরু করে।

আমেরিকার নারীবাদী অঙ্গনে পরিচিত-ব্যক্তিত্ব হেলেন সুলিংগার বলেছে-"পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আমাদের ওপর বিয়ের ধারণা চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা নারীরা এখন বুঝতে পারছি-বৈবাহিক এই কাঠামোই আমাদের পরাধীন ও ব্যর্থ বানিয়ে রেখেছে। তাই আমাদের প্রথম কাজ হলো, বিয়ের ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া। "থি

হেলেন এ-ও বলেছে, "নারীমুক্তির প্রথম শর্ত হলো, পারিবারিক কাঠামো নষ্ট করা। এ জন্য আমাদের কাজ হবে-স্বামীকে ছেড়ে আসার জন্য নারীকে প্রলুব্ধ করা। পারিবারিক জীবনে নিরুৎসাহিত করা। নয়তো নারী-নিপীড়নের ইতিহাস নতুন করে আবার লিখতে হবে।"প

নারীবাদের পুরোহিতদের এমন রাখঢাক ছাড়া বক্তব্যের তালিকা সুদীর্ঘ। ফেমিনিস্ট আইকনরা পারিবারিক কাঠামোর প্রতি তাদের বিদ্বেষ গোপন রাখেনি।

গ্লোরিয়া স্টেনাম বিবাহকে অভিহিত করেছে 'অপূর্ণাঙ্গ ও অর্ধেক মানুষের জন্য একটি ব্যবস্থা' বলে। আন্দ্রিয়া ডোরকিন লিখেছে, "এমন কাউকে কেমন করে কেউ

ভালোবাসতে পারে যে কিনা অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসা যেখানে কর্তৃত্ব করে?"

কেট মিলেট লিখেছে-"নারী যতদিন নিজের শারীরিক গুণের কারণে অনুগত হয়ে থাকবে, ততদিন সে স্বাধীন মানুষ হতে পারবে না।"

বেটি ফ্রিডেন একধাপ এগিয়ে গিয়ে আরও খাপছাড়া মন্তব্য উগড়ে দিয়েছে-"যে নারী গৃহিণী হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নেয়, কিংবা বড় হয়ে যারা ঘরকন্না করার ইচ্ছা পোষে, তাদের জীবন বন্দিশিবিরে আটকা পড়া সেসব মানুষের মতোই ভয়ংকর যারা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর পথে হেঁটে চলছে।"

লিন্ডা গর্ডোন বলেছে, "ছোট-পরিবার অবশ্যই বিলুপ্ত হবে, এটার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন। বর্তমানে পরিবারগুলোর ভাঙন এই ইঙ্গিতই দেয়। নিঃসন্দেহে এটা একটা বৈপ্লবিক অগ্রযাত্রা।"

রবিন মরগানের মন্তব্য: "যতদিন না বিবাহপ্রথা নিঃশেষ করব, ততদিন নাবীর প্রতি বৈষম্য-নিপীড়ন দূর করার আমাদের এই চেষ্টা আলোর মুখ দেখবে না।"

ম্যারি জো বেইন বলেছে, "মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুকে কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া ও সমতার সাথে প্রতিপালন করতে হলে অবশ্যই তাকে পরিবার থেকে আলাদা রাখতে হবে।"

ভিভিয়ান গরনিক লিখেছে: "ঘরসংসার করা, নিজেকে আড়াল করে রাখা, স্বামীর সেবা করা-এগুলো এমন বাসনা যা বাস্তব হতে দেওয়া উচিত নয়। নারীবাদের প্রধান কাজ হলো এমন ইচ্ছাকে পরিবর্তন করে দেওয়া।

বাস্তবতা হলো-সংসারবিমুখ, পরিবারবিদ্বেষী এসব নারী কর্মজীবনে গিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তি, পুঁজিপতি, অফিসের বস কিংবা উঁচুপদের সেনাকর্মকর্তার ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের নাটাই মূলত নারীভোগী কিছু পুরুষের হাতে। বিভিন্ন সময় নারীবাদী-কর্মীরা নিজেরাই এই সত্য স্বীকার করেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিখ্যাত 'দ্য গার্ডিয়ান'-ম্যাগাজিনে ন্যান্সি ফ্রেইজার নামের একজন নারীবাদী এ নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। প্রবন্ধের শিরোনামই ছিল- "নারীবাদ-

আন্দোলন কীভাবে পুঁজিবাদের হাতের পুতুলে পরিণত হলো: এর থেকে মুক্তির উপায় কী?

গ্লোরিয়া স্টেনাম। একজন মার্কিন ইয়াহুদি নারীবাদী-কর্মী। নারীবাদের অঙ্গনে তার বেশ নামডাক। এক সাক্ষাৎকারে সে নিঃসংকোচে স্বীকার করেছে, নারীবাদী আন্দোলন

বেগবান করার জন্য সে মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা 'সিআইএ'র কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পায়। নারীবাদী ম্যাগাজিন 'এমএস'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন এই স্টেনাম। এছাড়াও 'ইনডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ সার্ভিসের' পরিচালক তিনি। এতকিছুর পরও 'সিএআই' থেকে আর্থিক প্রণোদনা পেত সে।

পশ্চিমের চোখে নারী

নারী নয় সে, ''যৌনপণ্য

পরিবারের সাথে থাকে কিংবা একাকীই থাকে এমন কোনো 'স্বাধীনচেতা' মেয়ে। নিজের পড়াশোনা-থাকা-খাওয়ার খরচটা সে নিজেই চালাতে চায়। কিন্তু তার আয়ের কোনো বন্দোবস্ত নেই। এখন তবে সমাধান কী?

'নারী-স্বাধীনতার' দেশগুলোতে এর একটা সমাধানের চিত্র এমন-বাপের বয়সি কোনো এক ধনী-ব্যবসায়ী-পুরুষের যৌনসঙ্গী হবে সে। বাংলায় যাকে বলে 'রক্ষিতা'। বিনিময়ে তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে। সহজ কথায় 'যৌনশ্রমের' বিনিময়ে উপার্জন। পশ্চিমের ভাষায়-পার্টটাইম জব।

একটা ইন্টারভিউ দেখলাম। সাক্ষাৎকারদাতা অর্থাৎ যার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে তার এরকম ছয়জন ভাড়াকরা-যৌনসঙ্গী আছে। সে বলছে, "এভাবে বেশ কয়েকজন তরুণীকে একসাথে ভোগ করতে পারা বিয়ের চেয়ে বেশি আনন্দের। সুন্দরী একজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে পার্টি বা অনুষ্ঠানে যাওয়া নিজের-সঙ্গে-দৃষ্টিনন্দন একটা গাড়ি থাকার মতোই আভিজাত্যের।" তার কাছে এটাই নারীর মূল্য।

এভাবে যৌন-সেবা দেওয়ার অন্য ইউরোপের দেশগুলোতে বসানো হয় প্রকাশ্য-ব্যজার। আর অনলাইনে এই 'সেবার' পরিধি কতটা বিস্তৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রক্ষিতা-পেশায় নিয়োজিত তরুণী এবং তাদের খদ্দের-পুরুষদের সংখ্যা-প্রকৃতি নিয়ে বিশদ আকারের বেশকিছু পরিসংখ্যানও প্রকাশিত হয়েছে। ৮।

অবাক করা তথ্য হলো-এসব যৌন-সেবাদাত্রীদের যারা ভোগ করে, বিকিকিনি করে, তাদের অধিকাংশ কারা জানেন? শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা ওপরের সারির কর্মকর্তা।

সহিংসতার 'বিচিত্র রং'

(১)

স্বাধীনচেতা একজন তরুণী। তার মনজুড়ে আছে নিজেকে প্রমাণ করার নেশা। কিন্তু সমাজ তাকে তার মেধা-কর্মচঞ্চলতা-পরিশীলতা দিয়ে বিচার করে না। মূল্যায়ন করে

শুধু তার কায়িক সৌন্দর্যকে। ফলে অন্যের নজর কাড়ার নেশায়, সমাজে তার উপস্থিতি জানান দেওয়ার আশায় সে নিজেকে প্রদর্শন করছে-ঘরে বাইরে, রাস্তায় কিংবা স্কুলে। একটাই তার নেশা-সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করা।

নারীকে পণ্য ভাবার এই সামাজিক-প্রবণতা থেকে নিরাপদ নয় মেয়ে শিশুরাও। "নারীর প্রতি সহিংসতা, প্রতিদিন, প্রতি জায়গায়" শিরোনামের এক প্রতিবেদন সেই ইঙ্গিতই দেয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একাডেমি (এফআরএ) প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে মেয়ে শিশুদের সাথে ঘটে যাওয়া যৌন-নির্যাতনের অসংখ্য তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে।।২০।

(২)

বছরদুয়েক আগে জাতিসংঘ একটি খবর প্রকাশ করে। শিরোনাম: "দৈনন্দিন যাতায়াতে উত্যক্ত ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে অধিকাংশ নারী।" খবরে বলা হয়েছে-(চলতিপথে নারীর প্রতি যৌন হয়রানির) মতো এমন অপরাধ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে মহামারি আকারে।।।

'স্টেট সেক্রেটারি ফর উইমেন্স রাইটস'সহ আরও কয়েকটি ফরাসি সংস্থা মিলে এ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান-প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, দেশটিতে যেসব নারী নিয়মিত গণপরিবহন ব্যবহার করে তাদের শতকরা শতভাগই কোনো-না-কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। কী একটা অবস্থা, ভেবে দেখেছেন। ফরাসি একটি সংবাদ-সংস্থা যদিও ব্যাপারটিকে অতিরঞ্জিত বলে দাবি করেছে। তবে প্রকৃত পরিসংখ্যানটা এর কাছকাছিই হবে।

মা নয়, যেন জল্লাদ

পার্টনারের হাতে অপমান-নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর নারী তার অতীত স্মৃতি সব মুছে ফেলতে চায়। সে এমন কিছু সাথে বয়ে বেড়াতে নারাজ যা তাকে কষ্টদায়ক অতীতের কথা করিয়ে দেয়। আর এর প্রথম বলি হয়-গর্ভে থাকা প্রেমিকের সন্তানটি! আমেরিকার রোগনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে-গর্ভপাত-করা অধিকাংশ নারীই অবিবাহিত। আমেরিকাতে প্রতি বছর কমসেকম ১০ লাখ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। এর তিন ভাগের এক ভাগই হয় গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহ পরে। ২২ তার মানে গর্ভে ততদিনে প্রাণ এসে গেছে। আর এ ধরনের গর্ভপাত তো স্রেফ হত্যাকাণ্ড। প্রযুক্তি এখন ভ্রূণহত্যাকে আরও সহজ করে দিয়েছে। মিডিয়া ব্যাপারটিকে উপস্থাপন করছে গর্ভধারিণীর 'একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা' হিসেবে। একইসাথে দেওয়া হয়েছে আইনি বৈধতাও।

গর্ভপাতের ব্যাপারটি আপনি কল্পনা করতে পারছেন তো? এর কোনো চিত্র আপনাকে দেখনোর সাহস আমার নেই। খুবই ভয়াবহ। করুণ। আমি আপনাকে কিছু পরিভাষা বলছি। তাতে বাস্তবতা কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। আর আপনার সহনক্ষমতা বেশি হলে ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে নিতে পারেন।

গর্ভপাতে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো-ডিলেশন অ্যান্ড এভাকুয়েশন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক বিশেষ কিছু যন্ত্রের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে রিপিং, ব্রেকিং, সাকশন এবং অবশেষে ইনজেকশন করেন। তার মানে, গর্ভে থাকা সন্তানটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে বাইরে বের করা হয়। কতটা বর্বর!

গর্ভপাতের আরও কিছু পদ্ধতি আছে। যেমন: প্রোস্টাগ্লানডিন, সল্ট ইত্যাদি। সবগুলো পদ্ধতি ওই একই কাজ করে। আর তা হলো: মানবহত্যা! হৃদপিণ্ড যার সচল, সে ব্যথা অনুভব করে। আঘাতে কষ্ট পায়। এ যেন চিকিৎসকের মহড়ায়, আইনি ছত্রছায়ায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঠান্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড! আশঙ্কার খবর হলো-মুসলিম দেশগুলোসহ পুরো বিশ্বেই হু হু করে বাড়ছে গর্ভপাতের হার।

কোনো এক সকাল বেলা আপনি যদি পশ্চিমের হাসপাতালগুলোতে টু মারেন, করিডরের বারান্দায় কিছু ময়লার ঝুরি রাখা দেখবেন। গর্ভপাতের পর শিশুদেহের টুকরো অংশগুলো সেসব ঝুরিতে ফেলা হয়। এগুলোকে ওরা বলে 'মানবময়লা' (human garbage)!

সন্তান জন্মদানের পর যেসব নারী তা লালন-পালন করতে অনিচ্ছুক, পশ্চিমে তাদের জন্য রাস্তার পাশে রেখে দেওয়া আছে একপ্রকার বিশেষ বাক্স। বাচ্চাগুলোকে ডাস্টবিনে না ফেলে যাতে সেসব বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। 'স্বাধীন' সেই নারীরা আরও বেশি স্বাধীনতা নিয়ে সেসব বাক্স অহরহ ব্যবহার করে।

না। এখানেই শেষ নয়। বর্বরতার মাত্রা ছাপিয়ে গেছে বর্বরতাকেও। সন্তান প্রসব করাত পর জন্মদাতা নারী যদি সন্তানকে জীবিত না রাখতে চায়-তবে সেই নবজাতককে হত্যা করাও আইনির দৃষ্টিতে দোষের কিছু নয়। এটাকে বলে- 'আফটার-বার্থ অ্যাবোর্শন' তথা জন্ম-পরবর্তী গর্ভপাত। ওদের যুক্তি, ভ্রূণ আর নবজাতকের মায়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ফলে যেই যুক্তিতে গর্ভপাত করা বৈধ, সেই যুক্তিণাত আফটার-বার্থ অ্যাবোর্শনও বৈধ! পশ্চিমা সভ্যতা আমাদেরকে আর কতদূর নিয়ে থামবে, ভেবে দেখেছেন?

وَإِذَا الْمَوْءُ ودَهُ سُئِلَتْ بِأَيِ ذَنْبٍ قُتِلَت. ۝

"জীবন্ত-পুঁতে-ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে-কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। "

জাহিলি যুগে আরবের কোনো কোনো গোত্রে ছিল এই প্রথা-কন্যাসন্তান জন্ম নিলে জীবন্ত মাটিচাপা দেওয়া হতো। সেই বর্বরতা ফিরে এসেছে একুশ শতকের 'সভ্য' পৃথিবীতেও। পার্থক্য এতটুকু, তখন সেটা ছিল কোনো কোনো গোত্রে। আর এখন পুরো পৃথিবীতে। তখন সেটা ছিল স্রেফ রীতি বা প্রথা। আর এখন সেটা আইন।

আরেকটা পার্থক্য এই-এখনকার শিশুকে মরতে হচ্ছে শিক্ষিত, সাদা-এপ্রোন-পরা ডাক্তারের হাতে। সৌভাগ্যের বৈকি! আসল কথা হলো, এটা একটা দীর্ঘ পরিকল্পনার একেবারে চূড়ান্ত ফলাফল। ধাপে ধাপে নারীকে মাতৃত্বের সম্মান থেকে টেনে-হিঁচড়ে খুনির কাতারে নামিয়ে আনা হয়েছে। যেমন-তেমন খুনি নয়, নিজের সন্তানের খুনি।

এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলেন তা পশ্চিমা নারী-স্বাধীনতার পর্দার ওপারের দৃশ্য। এ আলোচনার সারকথাটা কী? পশ্চিমা নারীরা স্বাধীন হতে গিয়ে প্রথমে বাবা-ভাই কিংবা স্বামীর গণ্ডি থেকে বের হয়ে এল। অফিসের বস, রাজনীতিবিদ হয়ে উঠল তার কাছের জন। ফলাফল? সে হয়ে উঠল 'যৌনপণ্য'। পুঁজিবাদ তাকে টেনে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে-সার্টিফিকেট দেবে বলে; কর্মক্ষেত্রে-ভালো ক্যারিয়ার দেবে বলে। কিন্তু আসলে তাকে দিয়েছেটা কী? গণপরিবহনে ধাক্কা। দর্শকের কামাতুর দৃষ্টি। বসের অন্যায় স্পর্শ। পুঁজিপতির অস্পৃশ্য আলিঙ্গন।

আমি স্বামীর দাসী নই'

এমন একজন নারীর কথা ভাবুন যে নিজেকে স্বাধীন দাবি করে। 'বিয়ে করেছি বলেই স্বামীর দাসী নই'—স্লোগান দিয়ে স্বামীর আনুগত্য ও অভিভাবকত্ব দুই-ই সে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ অফিসে ট মেরে দেখবেন-সেই নারীই পুরুষ-বসের সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। বসের মন জগিয়ে চলতে যা যা করা দরকার সব কিছুই সে করছে। স্বামীর অভিভাবকত্ব সে মেনে নিতে পারে না; কিন্তু বসের কর্তৃত্ব, গোয়ার্তমি সে মুচকি হেসে মেনে নিচ্ছে। এখন বলুন তো, কোনটা তার জন্য ভালো ছিল? কে বলেছে তাকে স্বাধীন-হওয়ার-নামে অফিসের চাপ সহ্য করতে?

অথচ এই নারী যখন স্বামীর কাছে ছিল, পান থেকে চুন খসলেই সে ডিভোর্সের নাম নিয়ে ফেলত। সে বাবা-ভাইয়ের মতো প্রিয় মানুষগুলোর কর্তৃত্বও মানতে পারে না; কিন্তু অপরিচিত একদল লোকের কর্তৃত্ব ঠিকই মেনে নিচ্ছে!

এর আসল কারণ হলো: মাপকাঠির সংকট। পশ্চিমের ধারাবাহিক মগজধোলাই, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন আর মুসলিমদের কিছু ভুল চর্চার কারণে নারীর কাছে ইসলামের মাপকাঠিকে ত্রুটিযুক্ত মনে হয়। ফলে সে পুঁজিবাদের সেঁটে দেওয়া মাপকাঠি মেনে নিতে উদ্যত হয়। পুঁজিবাদী মাপকাঠি (জিডিপি) তাকে ইঙ্গিত দেয় আর্থিক স্বচ্ছলতার; দেয় টাকাপয়সা, দুনিয়াবি নামযশ অর্জনের হাতছানি। ফলে ওই অপরিচিত পুরুষটির কর্তৃত্ব সে হাসিমুখে মেনে নিতে পারে। তার কর্কশ গলাও মিষ্টি শোনায়।

একই নারী-পারিবারিক পর্যায়ে একক কর্তৃত্বের ধারণাকে বেমালুম অস্বীকার করে। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে এসে এই কর্তৃত্বকে সে পুরোপুরি সঠিক মনে করে! এই বৈপরীত্যের কারণ কী? পুঁজিবাদের কাঁচা-টাকার গন্ধ?

বর্তমানে মেয়েদের সামনে শারীআত-নির্ধারিত ক্বিওয়ামা তথা অভিভাবকত্বকে ঘৃণিত ব্যাপারস্যাপার হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। শারীআহর উদ্দেশ্যকে ভিন্ন

মনে খটকা লেগে যায়। সে আয়াতের অর্থটা এভাবে কল্পনা করে-পুরুষ তোমাকে করে। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে তোমার স্বাধীনতা ও মর্যাদা সে কিনে নিয়েছে।

অথচ আয়াতের মর্ম মোটেও এমন না। পুরুষ নারীর দেখভাল করবে। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তার ইজ্জত-আব্রুর কদর করবে। তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। আয়াতের নির্দেশনা এগুলোই। ইবনু আশূর বলেন, "নারীর ওপর পুরুষের কিওয়ামার অর্থ হলো-পুরুষ নারীর দেখভাল করবে। ভরণপোষণ ও আর্থিক চাহিদা পূরণ করবে। তার সার্বিক দায়িত্ব নেবে।"

এটা পুরুষের ওপর ফরজ। এই দায়িত্ব পালনে হেঁয়ালি করলে ইসলামি রাষ্ট্র তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। স্বামী যদি অপারগ হয় তাহলে রাষ্ট্র নারীর দায়িত্ব নেবে। আল্লাহ তাআলা এমনটা বলেননি যে নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ বলে এই কর্তৃত্ব লাভ করবে। নারীকে আগলে রাখা বরং পুরুষের স্বভাবজাত দায়িত্ব। এটা ইনসাফের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয়।

মহান আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ একে-অপরকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাউকেই এককভাবে প্রাধান্য দেননি। মাতৃত্ব, সন্তান-প্রতিপালন, পরিবার আগলে রাখা ও সন্তানকে আচার-ব্যবহার শেখানো-এই জায়গাগুলোতে তিনি নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ বিনির্মাণে নারীর এই ভূমিকাগুলো অন্য কাউকে দিয়ে পূরণ করা যাবে না এবং এক্ষেত্রে নারীর কোনো বিকল্পও নেই। কিন্তু সমস্যা হলো-পুঁজিবাদ এই দায়িত্বগুলোকে 'দায়িত্ব' বলে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ ওদের মন-মগজ কেবল টাকার

আশপাশেই ঘুরপাক খায়। তাই যে কাজে টাকা রোজগার হয় না, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় না, সে কাজে ওদের আগ্রহ থাকবে কেন!

অপরদিকে দিনমান পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন, পরিবারের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচের বন্দোবস্ত করা-এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা পুরুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সংসারের ভরণপোষণের দায় যেহেতু পুরুষ সামলাচ্ছে তাই অভিভাবকত্বও তাকেই দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু পুরুষের অধিকার নয়, দায়িত্ব। আবার পুরুষের এই অভিভাবকত্ব নারীর অধিকার। তাই এটা তার জন্য জুলুম নয় কোনোভাবেই।

ক্লিওয়ামা দুটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত-এক. পুরুষ-হয়ে-ওঠা এবং দুই, সংসারের দায়ভার ও খরচ মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করা। এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেবল পুরুষ লিঙ্গের অধিকারী হওয়া কিংবা 'নারীর চেয়ে উত্তম' হওয়া-৫ বিবেচনায় কিন্তু ক্বিওয়ামা দেওয়া হয়নি। ক্বিওয়ামার সম্পর্ক মূলত পুরুষের দায়িত্ব। পালনের-সক্ষমতার সাথে।

একজন মুসলিম নারীর কাছে যখন পুজিবাদ কিংবা বস্তুবাদের চাপিয়ে-দেওয়া খবরদারি মহান হয়ে ওঠে, আর আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব ঘৃণার বিষয় হয়ে যায়-তখন বুঝতে হবে ওই নারী রবের-দেওয়া-মাপকাঠিকে বুঝতেই পারেনি। কিংবা সে সেটাকে মনে ধারণ করেনি।

সমান অধিকার (equality) নাকি ইনসাফ (equity)

যে মেয়েটি প্রশ্ন করছে-স্বামী যদি মৃদু প্রহার করতে পারে, তবে আমাকেও কেন সেই অধিকার দেওয়া হলো না? ইসলাম কেন আমাকেও চার বিয়ের অনুমতি দিলো না? পুরুষকে আয়-রোজগারের দায়িত্ব দেওয়া হলো; আমাকেও কেন দেওয়া হলো না?-সে মূলত সমতা (equity) আর সমান-অধিকারকে (equality) গুলিয়ে ফেলেছে। সে বুঝতে ভুলে গেছে-সমতা মানেই দুজনের সমান হওয়া জরুরি নয়। ইনসাফ মানে উভয়কে আধাআধি বুঝিয়ে দেওয়া নয়। বরং ইনসাফ হলো প্রত্যেককে তার নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া।

সমান-অধিকারের ধারণা তার নিজের তৈরি 'মাপকাঠি'। অথচ সে মোটেও ভাবে না তার এই 'মাপকাঠি' কতটুকু সঠিক।

ইসলামের 'মাপকাঠি' একটাই। সেটা হলো-আল্লাহর আনুগত্য। তাঁর বিধানের ভিত্তি হলো-ইনসাফ বা সমতা। সমান-অধিকার ইসলামি মানদণ্ড নয়। কেননা,

সমান-অধিকার কখনো কখনো ন্যায়বিচার হতে পারে; আবার অন্যায়ও হতে পারে। বিপরীতে ইনসাফ কখনো অন্যায় হতে পারে না। যেখানে সমান-অধিকার প্রয়োজন, সেখানে সমান-সমান দেওয়া; যেখানে সমতা প্রয়োজন, সেখানে একজনেরটা কমিয়ে অন্যকে বাড়িয়ে দেওয়া-এটাই ইনসাফের মূল কথা।

সুস্থ, বিবেকবান কোনো মানুষ নারী-পুরুষের মাঝে ভিন্নতা অস্বীকার করতে পারে না। তাদের মাঝে যেমন শারীরিক পার্থক্য আছে। আচরণগত ভিন্নতা আছে। শক্তি-সামর্থ্যে তফাত আছে। আছে মানসিকতার ভিন্নতাও। এসব সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টন করাই-ইনসাফ।

ইউরোপের নারীরা অধিকার-বঞ্চিত হয়ে, পুরুষের হাতে নিপীড়িত হয়ে কোনো আসমানি পয়গামের কাছে ফিরে আসেনি। উলটো তারা আশ্রয় খুঁজেছে পশ্চিমা মানব-ধর্মে; মানুষের বানানো কায়দা-কানুনে। ফলে অর্জনের খাতা রয়ে গেছে শূন্যই। নিপীড়নের এক খাঁচা থেকে বের হয়ে তারা অন্য খাঁচায় বন্দী হয়েছে-পার্থক্য এটুকুই।

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের মধ্যকার এই ভিন্নতাগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। কেননা সৃষ্টি তো তিনিই করেছেন! আর বিধানও তিনি সেভাবেই দিয়েছেন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভালো জানবেন না? তিনিই তো সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। "[১২]

ইসলাম মা-বাবার দেখাশোনার বেলাতেও সমান-অধিকারের কথা বলেনি। বরং মা-কে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনিভাবে পরিবারের খরচপত্র দেওয়া পুরুষের জন্য ফরজ করে দিয়েছে। অথচ নারী ধনী হলেও, এমনকি স্বামীর চেয়ে টাকাকড়ি বেশি থাকলেও তার ওপর পরিবারের জন্য খরচ করা আবশ্যক নয়। নারী বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করা পুরুষের জন্য ফরজ করে দিয়েছে ইসলাম। এমনকি নিপীড়িত নারীর ডাকে জিহাদেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু পুরুষকে উদ্ধার করার জন্য নারীর ওপর জিহাদ ফরজ করেনি।

রেশমের পোশাক, সোনার গহনা ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম করলেও, নারীর জন্য জায়েজ রেখেছে ইসলাম। বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সন্তানকে কাছে রাখার অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়নি; নারীকে দেওয়া হয়েছে।

এটাই ইনসাফ। ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান দিয়েছে; সমান-অধিকারের নয়। তা হলে এখন একজন মুমিন-নারীর দায়িত্ব কী? তার দায়িত্ব-আল্লাহর বিধানকে খুশিমনে মেনে নেওয়া।

[১২] সূরা মূলক, ৬৭: ১৪।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ولا تَتَمَنوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا والنساء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِن فَضْلِه إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

"যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত দিয়েছেন, তোমরা সেসব বিষয় পাওয়ার কামনা কোরো না। পুরুষরা যা অর্জন করে তার ভাগ তারা পাবে, আর নারীরা যা অর্জন করে তারাও তার ভাগ পাবে। (সুতরাং অপরের জিনিস না চেয়ে) তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর করুণ চাও, প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ ভালো জানেন। "[২০]

আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য যেটাকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, নারীর সেটা কামনা করা উচিত নয়। একইভাবে, তিনি নারীর জন্য যেটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সৌটর প্রতি পুরুষের লোভ থাকা উচিত নয়।

নারী-পুরুষ সকলকে কে বানিয়েছেন? আল্লাহ! তাহলে বিধান দেবে কে? তিনিই। তাঁরই নির্দেশ-নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নিজ-নিজ অংশ রয়েছে। সেই সাথে আছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব।

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“সুতরাং ভালো নারীরা বিনয়ী হয় এবং আল্লাহ যেভাবে (তাদের) হেফাজতে রেখেছেন, তারাও সেভাবে (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে সবকিছু হেফাজতে রাখে।" [১৪]

তার মানে, নারী, তুমি আল্লাহর-দেওয়া-দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হও। তাহলে তিনি পুরুষের-হাতে-থাকা তোমার অধিকারগুলোও ঠিকঠাক আদায় করাবেন।

যার কাছে মাপকাঠির ধারণাই পরিষ্কার নয়, সে তো ক্বিওয়ামাকে খবরদারি আর চাপিয়ে-দেওয়া-শাসন মনে করবেই। তার কাছে সংসারকে মনে হবে দাসত্বের শেকল। আর যদি সে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নেয়, সঠিক চিন্তার অনুগামী হয়,

[১৩] সূরা নিসা, ৪: ৩২।

[১৪] সূরা নিসা, ৪: ৩৪।

তাহলে সে বুঝতে পারবে-এই ক্বিওয়ামাই তার নিরাপত্তা, সুখ, স্বাধীনতার চাবি।

আপনি যদি এই বাস্তবতা বুঝতে পারেন, নিজের তৈরি করা 'মাপকাঠি' ছুড়ে ফেলে রবের-দেওয়া-বিধানের আনুগত্য করেন, আল্লাহর শপথ-আপনি আর কোনো অভিযোগ খুঁজে পাবেন না। সবকিছু আপনার কাছে সাবলীল মনে হবে। মুক্তির আনন্দে আপনি হেসে উঠবেন।

পুরুষের অভিভাবকত্ব ও কিছু পারিবারিক-জিজ্ঞাসা

পারিবারিক পরিসরে নারীর স্বাধীনতা-সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন ও বিতর্ক আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এ পর্যায়ে আমরা সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

এক. অনেক সময় ঝগড়া লাগলে স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে নিজ নিজ অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্ত্রী স্বামীকে বলে-তুমি আগে আমার অধিকারগুলো আদায় করো! স্বামী তখন স্ত্রীকে বলে-আর আমার অধিকার? সেগুলো আদায় করবে কে? এ ক্ষেত্রে আমরা বলব, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কেবল শারীআতের বিধানের ওপর নির্ভর করে না। এই সম্পর্কের ভিত্তি হলো প্রেম-ভালোবাসা। 'নিজ নিজ অধিকার আদায় করে নেবে' না বলে বলা উচিত 'একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে'। নিজের দায়িত্বটুকু তো পালন করবেই। আগবাড়িয়ে অতিরিক্তও করবে। ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। কখনো উভয়েই উভয়কে ছাড় দেবে।

পরিবার তো আর অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান না যে প্রত্যেকে তার হিস্যাটুকু পাই-টু-পাই আদায় করে নেবে। অপারগতা থাকবেই। স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। সে-সময় আপনি তাকে রান্নার দায়িত্ব মনে করিয়ে দিলেন! এটাও ইনসাফ হবে না। কোনো বিষয়ে মতের অমিল হলে উভয়েই আল্লাহর দেওয়া ভালোবাসার কথা স্মরণ করবে। তিনি বলেছেন-

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে: তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পারো, আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।"

কোনো পরিবারে সারাদিন যখন 'আমার অধিকার' 'তোমার দায়িত্ব'-এসব কথাই বলতে শোনা যায়, তখন বুঝতে হবে পরিবারটি আল্লাহর দেওয়া পবিত্র ভিত্তির ন্যায়নীতি বা নিয়মকানুনের ওপর। কিন্তু পরিবারের ভিত্তি থাকে এর চেয়ে অনেক ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি দাঁড়িয়ে থাকে তার ওপরে। সেটা কী? সেটা আর কিছুই নয়-স্রেফ পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা।

দুই. অনেক সময় দেখা যায়, কোনো বিরোধ হলে দুজনই নিজ অবস্থানে শক্ত থাকে। স্বামী একটা বলল তো স্ত্রী পাল্টা একটা শুনিয়ে দিলো। স্ত্রী একটা বলল তো স্বামী মারতে উদ্যত হলো। এভাবে বিরোধ রূপ নেয় মারামারিতে। উত্তম হলো, ঝগড়ার সময় কাউকে-না-কাউকে নরম হতে হয়। একজন বললে অন্যজনের মুখ বন্ধ রাখতে হয়। তবে প্রতিবার একজনকেই নরম হয়ে যেতে হবে, চুপ মেরে থাকতে হবে-মোটেও তা নয়। এ দায়িত্বটা একেক সময় একেক জনের। তবুও যদি জানতে চাই-এই শান্ত হয়ে যাওয়াটা, মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নেওয়াটা কার ওপর বেশি বর্তায়? আমরা বলব, পুরুষের ওপর। আল্লাহ কী বলেন শুনুন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার আছে, পুরুষদের ওপর নারীদেরও তেমন অধিকার আছে, তবে নারীদের ওপর পুরুষদের রয়েছে বিশেষ এক মর্যাদা; আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। [১৯]

ইমাম তাবারি এ-র বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সবচেয়ে চমৎকার বক্তব্যটি দিয়েছেন ইবনু আব্বাস। তিনি বলেছেন-"আয়াতটিতে যে মর্যাদার করবে।" ইবনু আব্বাস এ এটাই বলতে চেয়েছেন-আমি চাই না স্ত্রীর ওপর-থাকা আমার অধিকারগুলোর সবই সে আদায় করে ফেলুক। কেননা আল্লাহ তাআলা

কথা বলা হয়েছে তার মর্ম হলো: স্ত্রীর ওপর থাকা কিছু দায়িত্ব বা অধিকারের প্রশ্নে স্বামী ছাড় দেবে। বিপরীতে স্বামীর ওপর থাকা দায়িত্বগুলো সে যথাযথভাবে আদায়

[১৫] সূরা রুম, ৩০: ২১।

[১৬] সূরা বাকারা, ২: ২২৮।

বলেছেন: 'নারীর ওপর পুরুষের রয়েছে বিশেষ এক দায়িত্ব: বিশেষ এক মর্যাদা।'

এর মানে হলো, স্ত্রীর ছোটোখাটো ভুল কিংবা উদাসীনতা স্বামী এড়িয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রীর বেলায় এসে সে কোনো কমতি রাখবে না। বিচারকের মতো বলবে না- "আগে তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করো।" বরং পুরুষ নিজ-দায়িত্বটুকু আদায় করে আল্লাহর কাছ থেকে তার মর্যাদা বুঝে নেবে।

ইমাম তাবারি আরও বলেছেন, আয়াতটির আক্ষরিক অর্থ যদিও সংবাদমূলক; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দিয়ে পুরুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন নারীর প্রতি দয়াপরবশ হতে। যাতে নারীর মনে পুরুষের প্রতি বিশেষ মর্যাদার বোধ আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যায়।

তার মানে, পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে কেবল পুরুষ হওয়ার কারণে নয়। বরং পুরুষ যখন নারীর প্রতি দয়াপরবশ হবে, আদর-সোহাগে রাখবে; তখন স্ত্রী মন থেকেই তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে।

ইমাম রাযির এ বক্তব্যও অনেকটা একই রকম। তিনি বলেন-যেহেতু আল্লাহ শক্তি-সক্ষমতায় নারীর চেয়ে পুরুষকে এগিয়ে রেখেছেন, তাই নারীর অধিকার বাস্তবায়নেও পুরুষ নিজেকে এগিয়ে রাখবে। নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করায় পুরুষ সচেষ্ট থাকবে-আয়াতে এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে সতর্কও করা হয়েছে। কেননা, নিয়ামাত বেড়ে গেলে বান্দার পাপে লিপ্ত হওয়ার, উদাসীনতায় ডুবে থাকার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই সতর্ক করা হয়েছে শুধু পুরুষকেই।

এটাই ইসলামি শারীআতে ক্বিওয়ামার মর্মকথা। যে-পুরুষ দায়িত্ব পালনে উদাসীন; আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বকে কেবল শাসন আর খবরদারির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। দয়াপরবশ-হওয়া থেকে সরে আসে। সে ক্বিওয়ামার অপব্যবহার করেছে। পরিবারে কর্তৃত্ব করার, সকলের আনুগত্য পাওয়ার দাবিদার সেই পুরুষই হতে পারে-যে দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতি করে না; ছাড় দেওয়ার বেলায় কৃপণতা করে না।

তিন. কেউ কেউ বলে থাকে, “পরিবারে কিওয়ামার ব্যাপারটা থাকারই-বা কী দরকার! কর্তৃত্বের প্রশ্নে উভয়ে সমান হওয়াই তো ন্যায়সঙ্গত।”

এগুলো একেবারে ফাঁকা বলি, অবান্তর কথাবার্তা। সব প্রতিষ্ঠানেই একজন প্রধান ব্যক্তি থাকেন। সলা-পরামর্শের পরে এমন কাউকে থাকতে হয়- যিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। অনেক নারীই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা মেনে নেন, কিন্তু পরিবারের বেলায় তা না বোঝার ভান করেন। পারিবারিক পরিসরে তারা পুরুষের নেতৃত্বকে নাকচ করে দেন।

তারা ভাবেন- "পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান। তাই স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এমনটা করা পুরুষতান্ত্রিক-মেজাজের প্রকাশ। স্ত্রীর ওপর জোর খাটানোর নামান্তর। অবাধ কর্তৃত্ব চর্চা। এসব মেনে নেওয়া অসম্ভব!"

আর এভাবেই সংসারে দানা বাঁধে নানা অশান্তি। ছোট ছোট বিষয়ও তখন ঝগড়ায় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিয়মের প্রতি অগাধ সম্মান, কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে এসবের মোড় নেয়। কখনো তো এই ছোট ব্যাপারগুলোই ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায়। পুজিবাদী থোড়াই কেয়ার! সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই।

মুসলিম-সমাজের বেশিরভাগ মানুষই পরিবারের মর্ম বোঝে না। তারা বিয়ে করে স্রেফ জৈবিক চাহিদা মেটাতে; আর মা-বাবা হওয়ার আনন্দ পেতে। অনেকের মনোভাব তো আরও উদাসীন-সবাই বিয়ে করে; তাই আমিও করছি। অথচ ইসলামে পরিবার কত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা! পরিবারকে কেন্দ্র করে ইসলাম কত সম্ভাবনার বীজ বোনে। মুসলিম-সমাজ বিনির্মাণে, আল্লাহর বিধিনিষেধ চর্চায়, মুসলিম-মেজাজ তৈরিতে পরিবারের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! পরিবার দ্বীনের শক্তিশালী এক ঘাঁটি!

আমি বোনদের বলব-স্বামীর সিদ্ধান্তে আপনি দ্বিমত করতেই পারেন। সুন্দরভাবে নিজের মতামতও তুলে ধরতে পারেন। নবিজির সম্মানিত স্ত্রীরাও সংসারের ব্যাপারে কখনো কখনো তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন। কিন্তু তার অবাধ্য হবেন না। সিদ্ধান্ত একবার নেওয়া-হয়ে-গেলে সেটা উপেক্ষা করবেন না। (তবে পাপকাজে বা অন্যের অধিকার নষ্ট-করা-বিষয়ে স্বামীর কথা মেনে নেওয়া যাবে না।)

চার. সমাজে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে। এটা একদম সত্য কথা। এখানে সমস্যাটা ওহির বিধানে নয়, বরং প্রয়োগকারীর। এমন পরিস্থিতিতে শারীআতের-দেখানো-উপায়ে স্বামীকে কিওয়ামার অপব্যবহার হতে বাধা দিতে হবে। প্রয়োজনে ইসলামি আদালতের মাধ্যমে এর একটা বিহিত করা যাবে। তবে উত্তম হলো, পারিবারিক সংকটগুলো ঘরোয়া পরিসরেই মিটমাট করে ফেলা। একান্ত বাধ্য না হলে প্রকাশ্যে বিচারের কাঠগড়ায় স্বামীকে দাঁড় না করানোই উত্তম। কিওয়ামাকে মনে করুন পরিবার পরিচালনার একটি গাড়ি। এখন ড্রাইভার যদি খারাপ হয়। হেঁয়ালিভাবে চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়-তার জন্য কি আপনি গাড়িকে দোষ দেবেন? আপনি বরং ওই ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। বলবেন-ড্রাইভারটা ভালো না!

পাঁচ কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন-আমি স্ত্রী হয়েও স্বামীর সাথে সংসারের খরচ মেটাই। তাহলে কি আমার জন্যও শারঈ ক্বিওয়ামা সাব্যস্ত হবে? উত্তর হলো-না। খরচে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে আপনি স্বামীর কাজটাকে সহজ করলেন। তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। তবে এর মাধ্যমে কর্তত্ব আপনার হাতে চলে যাবে না। কিওয়ামা প্রত্যেক 'ব্যয় বহনকারী পুরুষে'র জন্য সংরক্ষিত। আপনি সংসারে খরচ করে সহযোগিতা করেছেন কেবল। সহযোগিতা আর ক্বিওয়ামা এক জিনিস না।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

"যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা সেসব বিষয় পাওয়ার কামনা করো না।"[১]

ছয়. কেউ হয়তো বলতে পারেন, সংসারে আমি সহযোগিতা হিসেবে খরচ দিচ্ছি-ব্যাপারটা তা না। আসলে আমার স্বামী খরচপত্র মেটাতে অবহেলা করছে। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে খরচ করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার বক্তব্য হলো-

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষরা নারীদের পরিচালক, কারণ আল্লাহ তাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের সম্পদ (নারীদের জন্য) খরচ করে। [৮]

কিওয়ামা দুটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত-পুরুষত্ব ও ব্যয় বহন করার ক্ষমতা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি খরচ করতে অবহেলা করে, তবে ধরে নিতে হবে ক্বিওয়ামার দায়িত্বের ব্যাপারে সে আল্লাহর অবাধ্যতা করছে।

[১৭] সূরা নিসা, ৪: ৩২।

[১৮] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

প্রশ্ন হতে পারে, "বুঝলাম সে অবাধ্যতা করছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে জিওয়ানার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে? স্বামীর হাতেই?" উত্তর হলো-না। তার হাতে থাকতে না। আর এ-ব্যাপারে সকল ইমামই একমত।

এরপর যে প্রশ্নটা আসবে সেটা হলো-এখন তাহলে স্ত্রীর করণীয় কী?

এমন অবস্থায় স্ত্রীর অধিকার আছে-অনুমতি ছাড়াই স্বামীর টাকাপয়সা নেওয়ার। এভাবে প্রয়োজন অনুপাতে নিজের ও সন্তানের জন্য সে খরচ করবে। স্বামীকে সাংসারিক ব্যয় বহনে বাধ্য করতে চাইলে সে বিচারকের কাছেও যেতে পারে। আবার এমনটাও হতে পারে-বিচারকের অনুমতি নিয়ে সে নিজের টাকা খরচ করতে থাকবে। সমপরিমাণ টাকা আইনানুগ উপায়ে স্বামীর নামে জরিমানা হতে থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কোনো কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে না। সে চাইলে ঘর-সংসার না করে বাবার বাড়িও চলে আসতে পারে। তখন শারঈ কিওয়ামা চলে যাবে তার বাবা কিংবা ভাইয়ের ওপর। এমনকি স্ত্রী চাইলে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটাতে পারে।

সমাজে এমন কিছু পুরুষও আছে-যারা নানা ধরনের নেশা করে। তার কাছে নেশার খরচ যোগানো পরিবারের পেছনে খরচ করার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ! স্ত্রী এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে গালমন্দ করে। মারধরও করে। এমনটা খুবই দুঃখজনক। দাম্পত্য সম্পর্ক সুন্দর রাখা, পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া-এসবের জন্যই তো পুরুষকে কিওয়ামা দেওয়া হয়েছে। সেই স্বামীই কীভাবে পরিবারের বোঝা হতে পারে?

সাত. বলতে পারেন, সমাজে তো এমন চিত্রও দেখা যায় যে স্ত্রীর অধিকারগুলো স্বামী আদায় করছে না। তার প্রতি জুলুম করছে। এদিকে স্ত্রীর পরিবার দুর্বল হওয়ায় কিছু করতেও পারছে না। কিংবা আদালতে যাওয়ার পরও যথাযথ বিচার পাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই দিনের পর দিন নিপীড়ন সহ্য করে যেতে হচ্ছে। এদের ব্যাপারে কী বলবেন?

আট.হ্যাঁ, সমাজে এমন চিত্র অনেক আছে। তবে বুঝতে হবে, এই অন্যায়গুলোর কারণ ওহির বিধান নয়। ইসলামি শারীআত নয়। বরং এর জন্য দায়ী স্বামী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থা-এরা সকলে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে স্ত্রীর ওপর নিপীড়ন চাপিয়ে দিচ্ছে। তবে এমন পরিস্থিতিতেও শারীআত তাকে একাকী ফেলে

যায় না। বরং সহায়তার আশ্বাস দেয়। তাই তার উচিত শারীআতকেই ভালোভাবে আঁকড়ে ধরা।

এটি ফিওয়ামার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো-স্বামীর পক্ষ থেকে পরিবারে কী পরিমাণ ব্যয় করা আবশ্যক?

স্বামীর দায়িত্ব হলো-সে পরিবারের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে। তাদের ন্যায়সঙ্গত-চাহিদা পূরণ করবে। চলুন, আল্লাহর কাছ থেকেই শুনি-

لينفق ذو سَعَةٍ مَنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقِ مما أتاه الله لا يكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

খ্যার প্রাচুর্য আছে সে তার প্রাচুর্য অনুযায়ী খরচ দেবে, আর যার জীবিকা কম সে-অনুযায়ীই সে ভরণপোষণ দেবে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন; আল্লাহ প্রত্যেককে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি তার ওপর আরোপ করেন না; আল্লাহ অচিরেই কষ্টের পর সহজ করে দেবেন। "[৯]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, বস্তুবাদী প্রতিযোগিতায় গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য নন স্বামী। অঢেল বিলাসিতার জিনিসপত্র কিনে দিতে তাকে জোর করা যাবে না। অপচয় করতে স্বামী নারাজ থাকলে বলা যাবে না-"তুমি আমার অধিকার আদায় করছো না। তাই আমার ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।" ইসলাম তো এসেছেই সীমাহীন-ভোগের ইচ্ছায় লাগাম টেনে দিতে। নিত্যদিনের খাওয়া-পরা, দরকারি কাপড়চোপড়, চিকিৎসা, প্রয়োজন মনে হলে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া-স্বামীর খরচের দায় এতটুকুই।

নয়, বর্তমানে মুসলিম-দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। কাফিররা আমাদের অর্থনীতি কব্জা করে রেখেছে। এদিকে বেড়ে চলছে বেকারত্বের সমস্যা। চাকুরি হারিয়ে

কেউ কেউ অসহায় হয়ে পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে পুরুষ যদি পরিবারের খরচ মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে স্ত্রীর করণীয় কী?

এই বিষয়ে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। মূলত স্ত্রীর উচিত হবে ধৈর্য ধরা। অভাবের দিনগুলোতে স্বামীর পাশে থাকা, তাকে অভয় দেওয়া অতি উত্তম কাজ।

[১৯] সূরা তালাক, ৬৫: ৭।

আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন-

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে দয়াপূর্ণ আচরণের কথা ভুলে যেয়ো না।"

তবে সবর করাটা স্ত্রীর জন্য জরুরি কিছু নয়। সে চাইলে ভিন্ন কিছু ভাবতে পারে। তবে সে যদি স্বামীর প্রতি দয়াপরবশ হয়, তাকে একটু সুযোগ দেয়, সুদিন-আসছে- বলে অপেক্ষা করে-সেটা তো মহা-অনুগ্রহ। এই সময়ে স্বামীর উচিত হবে স্ত্রীর প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়া। তার এই সহানুভূতির প্রতি সম্মান জানানো। আদর-সোহাগে অভাবের কথা ভলিয়ে রাখা। স্ত্রী তাতে সবরের মাঝেও তৃপ্তি খুঁজে পাবে। কেননা, স্বভাবগতভাবেই সে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি নারীর হাতে অঢেল অর্থবিত্ত থাকলেও সে চায়-কেউ তার দায়িত্ব নিক: তার জন্য খরচ করুক।

বিচ্ছেদ কখনো সুখ বয়ে আনে না। আর অভাবের দায় স্বামীর একার নয়। এদিকে জালিমরা আমাদের টাকা-শুষে খাচ্ছে: আর সম্পদ পাচার করে আমাদেরকে পথের ভিখারি বানাচ্ছে। ফলে ধৈর্যই হতে পারে সবচেয়ে ভালো সমাধান।

হাদীসে এসেছে,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি রহম করো, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর রহম করবেন। "[১০১]

স্ত্রী যদি স্বামীর অভাবের দিনগুলোতে সহানুভূতিশীল হয়, তবে তাকে এত প্রতিদান দেওয়া হবে যা সে কল্পনাও করেনি। সহীহ বুখারি-র এক হাদীসে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ-এর স্ত্রী যায়নাব একবার নবিজি-এর কাছে লোক মারফত জানতে চাইলেন, তিনি যদি স্বামী-সন্তানের জন্য খরচ করেন তবে এর প্রতিদান পাবেন কি না? কারণ ওই সময়টাতে তার স্বামী অভাবের দরুন পরিবারের জন্য খরচ করতে পারছিল না। নবিজি বললেন, হ্যাঁ, সে দুটো প্রতিদান পাবে। একটা পারিবারিক-সম্পর্ক বজায় রাখার পুরস্কার। আরেকটা সদাকার পুরস্কার। ১০২৯

[১০০] সূরা বাকারা, ২: ২৩৭।

[১০১] আবূ দাউদ, ৪৯৪১; তিরমিযি, ১৯২৪।

[১০২] বুখারি, ১৪৬৬; মুসলিম, ১০০০।

দশ, স্বামীর ওপর এটা তার পক্ষ হতে সদাকা। কেননা, এই খরচ-করাটা তার জন্য আবশ্যক ছিল না। স্বামীও এটাকে স্ত্রীর দায়িত্ব বলতে পারবে না। বরং মনে করবে এটা তার ওপর স্ত্রীর অনুগ্রহ ও সদাকা।

এগারো. নারীকে দেওয়া এসব অধিকার নিয়ে আলাপ করতে গেলে কোনো কোনো পুরুষ বলে থাকে-এগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার দরকার নেই। হতে পারে এসব জানার পর তারা বিগড়ে যাবে।

এটা অত্যন্ত বাজে ধারণা। মুর্খ থাকার চেয়ে উত্তম হলো-প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে জেনে নেবে। দায়িত্বটুকু বুঝে নেবে। এতে ইসলামি শারীআতের নিখুঁত-নির্দেশনা জেনে তারা আশ্বস্ত হবে। আসমানি বিধানের সর্বজনীন কল্যাণ নিয়ে তাদের মনে কোনো সংশয় থাকবে না। যখন সকলেই শারীআতের কর্তৃত্ব মেনে নেবে, প্রকৃতপক্ষে তখন আর কারও 'কর্তত্ব' থাকবে না। কেউ আর অন্যায় আচরণের শিকার হবে না। শারীআতের বিধান নিয়ে তাদের মনে কোনো আপত্তিও দানা বাঁধবে না। তবে তাদের আলাপ ভিন্ন-যাদের অন্তরে রোগ আছে, যারা নিজেই 'রব-হয়ে-ওঠার' বাসনা লালন করে।

মানুষ যখন ওহির কোনো বিধানকে ছেড়ে দেয়, তখন আল্লাহ তাকে সেই বিধানের আরও বেশি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন-যদিও মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। নারী-পুরুষ উভয়েই যখন আল্লাহর শারীআত থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন কিছুতে সমাধান খুঁজেছে-তখনই পদে পদে তারা শারীআতের প্রয়োজনীয়তা টের পেয়েছে।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, অনেক মুসলিম শারীআতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও স্বার্থের বেলায় এসে তা ভুলে থাকতে চায়; শারীআত থেকে সুবিধাজনক অংশটুকু বেছে নিয়ে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এটা নিঃসন্দেহে দুমুখো-আচরণ (নিফাক)। এর মাধ্যমে মানুষ আসলে নিজেকেই ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون(

"আর (রাসূল) তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন-এ উদ্দেশ্যে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের ডাকা হয়, তখন তাদের একটি দলআচমকা মুখ ফিরিয়ে নেয়; আর সত্য তাদের অনুকূলে থাকলে, তারা তাঁর কাছে সানন্দে চলে আসে! "[১০০]

এগারো, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে: স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বেশি শিক্ষিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রী উচ্চশিক্ষিত অথচ স্বামী অশিক্ষিত হয়-তবুও 'ক্বিওয়ামা' কেন পুরুষেরই থাকবে? শুরুতেই বলব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট শুদ্ধ-জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। তবুও স্বামী যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়-অর্থাৎ তার যদি মানসিক বিকার বা পাগলামি থাকে-তাহলে পারিবারিক বিষয়গুলোতে স্ত্রী তার শ্বশুরবাড়ি অথবা বাবার বাড়ির দায়িত্বশীল কারও পরামর্শ চাইতে পারে। কিংবা সে চাইলে বিচারকের দারস্থও হতে পারে। কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা দিয়ে কখনোই শারীআতকে বিচার করা যাবে না। ক্বিওয়ামা সাধারণত পুরুষেরই। বিশেষ কোনো কারণে স্বামীর কিওয়ামা দূর হয়ে গেলে স্ত্রীর বাবা কিংবা ভাই সেই দায়িত্ব নিয়ে নেবে।

বারো, ফরজ পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন, চিকিৎসা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা—এমন জরুরি ব্যাপারগুলো ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে স্বামী যদি স্ত্রীকে বারণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে সেটার কারণ ব্যাখ্যা করা জরুরি নয়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর বারণ মেনে নেওয়া। কথায় কথায় বেঁকে বসা পরিবার ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এটা কারও দিক থেকেই হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে: তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পারো, আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।" [১০৪]

পরিবারের ভিত্তি হলো- আল্লাহর-দেওয়া ভালোবাসা ও দয়া। 'যখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যায়, বিবাদ লেগে যায়'-ভালোবাসার ভিত্তি নড়বড়ে বলেই এমনটা হয়। ভালোবাসা কমে যাওয়াটাই আসল সমস্যা। ভালোবাসা কমে গেলে

[১০৩] সূরা নূর, ২৪: ৪৮-৪৯।

[১০৪] সূরা রূম, ৩০:২১।

স্ত্রীর বিষয়গুলো স্বামী গুরুত্বের সাথে দেখতে চায় না। এমন পরিস্থিতিতে একজন বুদ্ধিমান নারীর ভূমিকা হবে-দুজনে আলোচনায় বসা। পরস্পরের অভিযোগগুলো শোনা। সেসব হতে বের হওয়ার উপায় খোঁজা। ভালোবাসা বাড়ানোর চেষ্টা করা।

সেটা না করে কিওয়ামা অস্বীকার করে বসা কিংবা স্বামীর অভিভাকত নিয়ে প্রশ্ন তোলা দিনশেষে তার জন্য সুখকর কিছু হবে না। স্বামী যখন সারাদিন খেটেখুটে বাসায় ফিরেই

তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে দেখবে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই সেই 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' অর্থাৎ স্ত্রীর চাহিদায় কান দিতে চাইবে না। দুজনেরই কর্তব্য হলো-প্রথমে পরিবারের ভিত্তি তথা পরস্পরের মাঝে ভালোবাসার বন্ধনকে মজবুত করে নেওয়া।

এটাই হলো শারঈ কিওয়ামার সামগ্রিক রূপ। একজন নারী এই পরিপূর্ণ চিত্রটা যখন তার সামনে রাখবে তখন সে নবিজির কথার মর্ম বুঝতে পারবে। তিনি বলেছেন-

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

"সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো নারী তার স্বামীর হক আদায় না করা পর্যন্ত তার রবের হকও সে আদায় করতে পারবে না।" [১০০]

যে স্বামী তার দেখভাল করছে, তার সম্মান টিকিয়ে রাখতে সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে, তাকে বুকে আগলে রাখছে-ক্বিওয়ামার দাবি তো তারই হওয়ার কথা। বলা যায়, ক্বিওয়ামা একজন পুরুষের সহজাত-প্রাপ্য।

ইসলামি শারীআতকে খোলামনে দেখলে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে নিন্দুকদের হৃদয়ও ভালোবাসায় ভরে যাবে। যে ব্যাপারটা সে সন্দেহের চোখে দেখত, প্রশ্ন করত, সেটাই এখন তার গৌরবের কারণে পরিণত হবে। একজন মুসলিম নারী তখন বুঝতে পারবে-কী এক অমূল্য গহনা এতদিন সে বাক্সে বন্দী করে রেখেছে; শারীআতের গহনা দিয়ে সাজাতে পারেনি নিজেকে!! শারীআত-তার সেই আড়ালে রয়ে যাওয়া গহনা। ক্বিওয়ামা-তার সেই সুখের পায়রা। কিওয়ামার নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত নারীর সংসার যদি সে দেখত! কী হৃদয়বিদারক, বিভীষিকাময়!

[

পশ্চিমের চোখে নারী

আমি যখন নারীমুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। এই বিষয়ক নানান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে থাকি। তখন এতে পশ্চিমা নারীদের প্রতি আমার সহানুভূতি বেড়ে যায়। আমি খুব করে উপলব্ধি করি- 'মুসলমানের পতনে বিশ্ব কী হারালো?'

আমার এতক্ষণের আলাপে পশ্চিমের বাইরের যেসব অমুসলিম দেশ আছে-যেমন: চীন-জাপান বা সিঙ্গাপুর-সেসব দেশের নারীদের কথা আসেনি। তবে তাদের অবস্থাও পশ্চিম থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। কেননা, একই ফর্মুলা তো এই দেশগুলোও অনুসরণ করছে। তেতো ফলের গাছ লাগিয়ে মিষ্টি ফল তো আশা করা যায় না! একইভাবে বেতন-

পদোন্নতিতে নারী-পুরুষের অসমতা নিয়েও আমি বিস্তারিত কিছু বলিনি-যদিও এটা অনেক দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে।

কোথাও কোনো আলো নেই

কেউ হয়তো বলতে পারেন, আপনি কেবল পশ্চিমা নারীসমাজের মন্দ পরিণতিগুলোই তুলে ধরলেন। তাদের আলোকময় অর্জনগুলোও তুলে ধরুন!

আলোকময় দিক? যেখানে নারীর মাথার ওপরে কালো ছায়া দিনদিন ঘনীভূত হচ্ছে, তার চাপা কান্নায় বাতাসের সুর বদলে যাচ্ছে, তার না-বলা কথা শব্দ-বোমায় রূপ নিচ্ছে, তখন আপনি কোন আলোর কথা বলতে বলছেন আমাকে? আপনি আমাকে আঁধারে আলো খুঁজতে বলছেন?

কোন আলোকময় অর্জনের কথা বলছেন আপনি? গুটিকয়েক নারীর শিক্ষিত হয়ে ওঠা? শুধুই ডিগ্রি অর্জন? এসবের কী মূল্য আছে যদি সে আগামীর-প্রজন্ম গড়ে যেতে না পারে? এই জ্ঞানবিজ্ঞান-আবিষ্কার-অধ্যয়নের কী আবেদন আছে-যদি-না নারী এমন একদল মানুষ তৈরি করে যেতে পারে যারা নিভিয়ে দিতে পারে এই যৌন-উন্মাদনার শিখা? একজন মা এত এত ডিগ্রি দিয়ে কী করবে যখন তার সন্তানের লালসা ছারখার করে দেয় নারীর ভবিষ্যৎ? তা ছাড়া-

নারীর সফলতা মানে কি কেবল পুরুষের সাথে পথেঘাটে শত্রুতা?

পরিবার ও সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অবাধ স্বাধীনতার চর্চাতেই নারীর সফলতা?

নারী বস্তুগত সাফল্য যতটুকু অর্জন করেছে এর কৃতিত্ব কার? নারীবাদী আদর্শই কি এর মূলে ভূমিকা রেখেছে?

এই সফলতা কি আরও উত্তম কোনো উপায়ে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করা সম্ভব ছিল না?

নারী-পুরুষ উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে যদি সজাগ থাকে এবং এর ফলে যদি একটি টেকসই পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠে, একটি সুস্থ নীতিবান প্রজন্ম গড়ে উঠে-তবে সেটা কি এই সাফল্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক?

কুরআনের চোখে নারী

নারীমুক্তি আন্দোলনের আড়ালের চিত্র কিছুটা দেখলাম আমরা। এসব মাথায় রেখে আমরা এবার পবিত্র কুরআনের কাছে যাব।

মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন-

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أموالهم

"পুরুষরা নাবীদের পরিচালক, কারণ আল্লাহ তাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের সম্পদ (নারীদের জন্য) খরচ করে। শলা

তিনি আরও বলেন,

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহযোগী তারা ভালো কাজের 'আদেশ দেয়, খারাপ কাজে বাধা দেয়। শা

সূরা নিসা, ৪

সূরা তাওবা,৯

আপনি যখন পশ্চিমের 'ব্যাটার্ড উম্যান সিন্ড্রোম' তথা প্রহারে-ভীষণভাবে আহত নারীর করুণ মুখচ্ছবি দেখবেন, তখন স্মরণ করুন কুরআনের কথামালা। শুনুন আমাদের রব কী বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।

তিনি আরও বলছেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নারীদের ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার আছে, পুরুষদের ওপর নারীদেরও তেমন অধিকার আছে।"[**]

আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ

"তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। "[১]

এর আগে আপনি জেনে এসেছেন নারীকে স্রেফ যৌনপণ্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না পশ্চিমা-সমাজ। আপনি যখন দেখবেন তারা নারীকে 'সেক্সুয়াল অবজেক্ট' হিসেবে মূল্যায়ন করছে তখন কুরআন খুলে দেখুন। দেখুন নারীর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কেমন দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পণ্য তো দূরের কথা, তিনি ঈমানদারের জন্য নারীকে উপস্থাপন করেছেন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। শুনুন আল্লাহ কী বলেন-

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

"আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন।" বোন, আপনার জন্য আল্লাহ যাকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন, তাকে চেনেন তো? কে তিনি? তিনি ছিলেন একজন মুমিন নারী। আর তিনি কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা জানেন তো? তৎকালীন ক্ষমতাধর শাসক ফিরআউনের বিরুদ্ধে। যে ফিরআউন কিনা মানুষকে আল্লাহর গোলামি ছেড়ে তার গোলামির দিকে নিয়ে যেত। সেই ফিরআউনের বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর এই বিদ্রোহ-করাটা আল্লাহ পছন্দ করেছেন। ফলে তাকে অনুসরণীয় বানিয়ে দিয়েছেন সকল যুগের নারীর জন্য। আপনাকেও বিদ্রোহ করতে হবে এ-যুগের ফিরআউনদের বিরুদ্ধে। কারণ তারা মানুষকে তাদের গোলাম বানাতে চায়। তারা আল্লাহর দাসত্ব ভুলিয়ে দিতে চায়।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

"আর (তিনি মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইমরানের মেয়ে মারইয়ামকে। "[৬]

লক্ষ করুন, আল্লাহ কিন্তু এই দুজন নারীকে তাদের সৌন্দর্যের কারণে মানুষের জন্য অনুকরণীয় করেননি। কিংবা বস্তুগত অর্জনের কারণেও নয়। তারা ছিলেন এমন নারী, যারা অনুসরণীয় হয়ে আছেন তাদের ঈমানের কারণে। তাদের চারিত্রিক পরিশীলতার কারণে। ইনসাফের প্রতি তাদের ইস্পাতসম শক্ত অবস্থানের কারণে।

আপনি যখন দেখেন-পুঁজিবাদী-সমাজ মুনাফার লোভে নারীকে 'পণ্য' বানিয়ে ফেলছে, তখন নিশ্চয়ই আপনার জানতে ইচ্ছে করে-এ কাজকে আল্লাহ কীভাবে দেখেন? দেখে নিন সেসব পুঁজিপতির ওপর আপনার রব কতটা রাগ করে আছেন। শুনে নিন নারীর ইজ্জত আপনার রবের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ-

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা চরিত্রবতী অসাবধান মুমিন নারীদের অপবাদ দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর করুণা থেকে তাদের দূরে রাখা হবে, আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"

[৬৩] সূরা তাহরীম, ৬৬ ১২।

[৬৪] সূরা নূর, ২৪: ২৩।

আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন নারী-পুরুদ উভয়ের জন্য আল্লাহর দ্বীনের কাছে ফিরে যাওয়া কতটা জরুরি। কেবল আমরাই না, গোটা মানবজাতি আজ অধঃপতনে। এ থেকে রেহাই পেতে রবের-জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

ধিক তাদের! যারা আমাদের সমাজে অবাঞ্চিত করতে চায় আল্লাহর দ্বীনকে। আর চাপিয়ে দিতে চায় পশ্চিমা দুর্দশা!

অষ্টম অধ্যায়

সুপার উইমেন

যে নারী 'প্রভু-হয়ে-উঠেছে'

নবিজি বহুকাল আগেই বলে গেছেন মুসলিমরা সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের অনুকরণ করতে চাইবে। তাঁর ভাষায়-

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لسلكتموه

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে।"

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের?"

রাসূল বললেন, "তবে আর কাদের?"।

খেয়াল করুন, রাসূল বলেছেন-গুইসাপের গর্তে ঢুকলেও আমরা তাদের অনুসরণ করতে চাইব। তার মানে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গুরুতর বিষয়েও মুসলিমরা তাদের পিছুপিছু ছুটবে; নিজেই নিজের 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা নিয়ে পশ্চিমকে অনুসরণ করবে। 'নিজেই নিজের প্রভু-হয়ে-ওঠা'-ব্যাপারটা আসলে কী? আমরা প্রথমে এর স্বরূপ ও পরিণতি বোঝার চেষ্টা করব। তারপর দেখব মুসলিম নারীরাও শুরুতেই জেনে নেব এ-বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"তুমি কি তাকে দেখেছ-যে নিজের খেয়ালখুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?"।

তিনি আরও বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِين.

"আচ্ছা, মানুষ কি ভেবে দেখেনি-আমি তাকে সৃষ্টি করেছি একফোঁটা বীর্য থেকে? আর এখন কিনা সে স্পষ্টভাষী তর্কবিদ হয়ে উঠেছে।

প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ মূলত নিজেকে প্রভুর আসনে বসায় নিজের অজান্তেই। আমিই আমার প্রভু! জীবন আমার, শরীর আমার সিদ্ধান্তও আমারা এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে রবের সাথে 'স্পষ্টভাষী তর্কবিদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, মানুষের এই 'প্রভু দাবি'র সাথে পশ্চিমা-সমাজের সম্পর্কটা কী আমরা দেখতে পাই, নিজেকে 'প্রভু দাবি'র সূচনাটা হয়েছে মূলত আহলে কিতাবদের হাত ধরেই। এর শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় তাদের ইতিহাসেই। তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে ইলাহকে চিত্রিত করা হয়েছে মানুষের মতোই। তিনি গড়নে বলনে-আচরণে মানুষের মতোই! খানপিনা করেন, ঘুমান, আবার মানুষের মতোই ক্লান্ত হন। কণ্ঠও তার মানুষের মতোই। ৩। আধুনিক-মানুষ এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে। সৃষ্টিকর্তার সবকিছু যদি আমার মতোই হয়, তাহলে আমার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো কেন একজন 'মানবীয় সত্তা' নেবে? তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে ইলাহ-এর ব্যাপারে দাবি করা হয়েছে-তিনি মানুষকে জ্ঞানহীন, মূর্খ করে রাখতে চান; যেন মানুষ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে। ঠিক এ-কারণেই তিনি আদমকে 'জ্ঞান-বৃক্ষ' থেকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এই গাছের ফল খেলে সে কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুর জ্ঞান লাভ করে ফেলবে। এরপর আদম যখন ফল খেয়ে ফেলল, কল্যাণ-অকল্যাণ জানার ক্ষেত্রে সে ইলাহ-এর 'সমকক্ষ' হয়ে গেল।

ফলে ইলাহ-এর আশঙ্কা হলো আদম হয়তো 'শাজারাতুল হায়াত' তথা 'জীবনবৃক্ষের' ফলও খেয়ে বসবে! তাতে সে দৈহিকভাবেও আমার মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে চিরজীবী হয়ে যাবে। এভাবে তো সকল দিক থেকেই সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসবে! তাই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিলেন।

তাদের চোখে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান কী জঘন্য! যিনি কিনা নিজের দুর্বল-সৃষ্টির সামনেই দুর্বল, ভীত এমনকি হিংসুটে! ইসলামে স্রষ্টার ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের এসব অসার, পৌরাণিক, মনগড়া কিসসা-কাহিনি থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছাই বাস্তব।

তিনি যখন কিছু চান শুধু এতটুকু বলেন-'হও'। সাথে সাথে সেটা হয়ে যায়। মানুষের সাথে তাঁর নিঃসীম শক্তির কোনো তুলনা চলে না। তাঁর শক্তিমত্তা-রাজত্ব-জ্ঞান এসবের কোনোটিই ক্ষণিকের জন্যও মানুষের কল্পনায়, চিন্তায় ধারণ করা সম্ভব না।

সুতরাং বোঝা গেল, মানুষের এই 'প্রভু-হয়ে-ওঠা'র ধারণা আহলে কিতাবদের মনগড়া রচনা থেকেই নেওয়া। ইউরোপে যখন দর্শন-মতবাদের বিস্তার ঘটল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আপাত 'উন্নতি' হলো-তখন 'প্রভু হয়ে ওঠার' এই প্রতিযোগিতা সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল। ইউরোপের পণ্ডিতরা ভেবে বসল, স্রষ্টা এতদিন যে জ্ঞান আড়াল করে রেখেছে মানুষ তার গবেষণা-শক্তি দিয়ে তা উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে।

মুসলিমদের জন্য বিরাট এক অনুগ্রহ হলো এই যে-ইসলাম জ্ঞানকে রবের বিপরীতে দাঁড় করায়নি। ইলাহ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখায়নি। ইসলাম জ্ঞানের সংজ্ঞাই দিয়েছে 'আল্লাহকে-চেনার-উপায়' হিসেবে। ফলে জগৎসংসার নিয়ে মানুষ যখন সাদা-মনে ভাববে, গবেষণা করবে তখন সে ইলাহ-কে আরও ভালোভাবে চিনতে পারবে। তাঁর অস্তিত্ব আরও সরবভাবে টের পাবে। এর ফলে রবের প্রতি তার ঈমান-আনুগত্য বেড়ে যাবে।

كل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يُنشئ النشأة الأجرة إلى الله على كل شي و قدير

"তুমি বলে দাও, 'তোমরা দুনিয়ায় সফর করো আর দেখো-আল্লাহ কীভাবে সত্তির সূচনা করেছেন। তারপর আল্লাহ (তাদের মৃত্যু দিয়ে। আরেকবার জীবিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" "

إن في خلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الليل والنهار لآيات الأولى الألباب:

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তন-এসবের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। "

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَإِنْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق

"দিগদিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি আমার নিদর্শনগুলো তাদের দেখাতে থাকব, যতক্ষণ-না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে-এটাই (কুরআন) সত্য। "

পশ্চিমে কেউ ধর্মে বিশ্বাস না আনলে তাকে বলে নাস্তিক। ধর্ম নিয়ে সন্দেহে ভুগলে তাকে বলা হয় অজ্ঞেয়বাদী। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে পশ্চিমে অজ্ঞেয়বাদী কিংবা নাস্তিক হওয়ার প্রবণতা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়েছে। কিন্তু সে-তুলনায় বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য-দ্বীন অনুসন্ধানের চেষ্টা খুব কমই দেখা গেছে।

কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবণতা হলো সে গোলামি করবে। ধর্মের প্রতি তার টান থাকবে। ফলে তার এই সন্দেহবাদী মন কিংবা ধর্মত্যাগ-করে শূন্য হয়ে যাওয়া যে হৃদয়-সেখানে জায়গা করে নেয় নতুন কোনো সত্তা। মিথ্যা কোনো ইলাহ। আর সেই মিথ্যা ইলাহ হলো-তার প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশি।

এভাবেই মানুষ নিজেকে 'প্রভুর আসনে' বসায়। তার সবকিছুর কেন্দ্রে থাকে প্রবৃত্তি; খেয়ালখুশি। এটাকে মাপকাঠি ধরেই সে তার জন্য ভালো-মন্দ, করণীয়-মার্জনীয় নির্ধারণ করে। অর্থাৎ যেটা আমার ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করে, যা করতে আমার

ভালো লাগে, সেটাই আমার জন্য কর্তব্য। আমার মন যেটাকে খারাপ মনে করে। আমার খেয়ালখুশি যেটা করতে সায় দেয় না, সেটাই আমার জন্য বর্জনীয়। কামনা করতে

থাকে-জগতের সবকিছু তার 'ইচ্ছার' সামনে মাথানত করুক: তার প্রবৃত্তিকে স্বীকৃতি দিক।

আরও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এই ছাঁকনি দিয়েই ধর্মীয় বিধিনিষেধ সে গ্রহণ কিংবা নাকচ করে। ধর্মের যেটক তার 'মনে-যা-চায়' তার সাথে মিলে যায়, সেটুকু সে মেনে নেয়। আর যেটক তার 'ইচ্ছার' সাথে সাংঘর্ষিক, সেটুকু সে নির্দ্বিধায় ছুড়ে ফেলে দেয়। কিংবা পরিবর্তন-পরিমার্জন করে নিজের 'প্রভুত্বের' সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

এমন অবস্থায় মানুষের কাছে আসলে 'নিষেধ' বলে কিছু থাকে না। সবকিছু করার বৈধতা সে পেয়ে যায়।

পশ্চিমা-সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের নিকট ইলাহের ধারণা মোটামুটি কাছাকাছি। অর্থাৎ উভয়েই রবের বিধিনিষেধের চেয়ে নিজের 'ইচ্ছাকে' বেশি প্রাধান্য দেয়। তবে নারীদের বেলায় একটা জায়গায় ভিন্নতা আছে। সেটা হলো-তারা রবের বিধিনিষেধের সামনে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং রবের প্রতি বিদ্বেষও লালন করে। শত্রুতা পোষণ করে। কারণ? ইউরোপের নারীরা যখন দেখতে পেল তাদের ধর্মীয়-কেতাবে নারীকে কোনো সম্মান দেওয়া হয়নি। উপরন্ত হাওয়ার 'পাপের' কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তাদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে তারা খেপে গেল। খেপে গিয়ে তারা রবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলো। পশ্চিমা দুনিয়ায় নারীর 'প্রভু হয়ে ওঠার' নানান উদাহরণ আমরা দেখতে পাই-

এক. খ্রিষ্টীয় নারীবাদীদের একটা ওয়েবসাইট আছে। নাম-ক্রিশ্চিয়ান ফেমিনিজম টুডে (সি.এফ.টি)। তাদের দাবি, 'ঈশ্বরকে' 'she' তথা নারীবাচক সর্বনাম দিয়ে ডাকতে হবে।

দুই. গডেস মুভমেন্ট তথা দেবী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল কথা হলো-তারা নারীকে মনে করে 'দেবী'। আর পুরুষ হলো মানুষ। দেবী একদিন মানুষের ওপর বিজয়ী হবে। অর্থাৎ নারী একদিন পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করবে। পৌত্তলিক-ধাঁচের এই আন্দোলনের পুরোহিত কারা জানেন? ইউরোপের 'আধুনিক শিক্ষিত
'অধ্যাপকেরা। যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য একজন হলো ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ড. ক্যারোল টি. ক্রাইস্ট।

এই মতাদর্শের ওপর লেখা দুটি বইও আছে। নাম-উইভিং দা ভিশন, নিউ প্যাটার্নস ইন ফেমিনিস্ট স্পিরিচুয়ালিটি (১৯৮৯) এবং উম্যান-স্পিরিট রাইজিং (১৯৭৯/৮৯)। ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ঢাকঢোল পিটিয়ে এই মতাদর্শ প্রচার করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে ক্যারোল ক্রাইস, আয়োজিত ১৯৭৮ সালের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সেমিনারটি উল্লেখযোগ্য। সেই সেমিনারের শিরোনাম ছিল: "গ্রেট গডেস রি-এমার্জিং কনফারেন্স।"

তারা মনে করে, 'ঈশ্বর'কে হতে হবে নারীর মনমতো। এবং তাকে অবশ্যই নারী জাতীয় কিছু হতে হবে। 'ঈশ্বর'কে নারীরূপ কিছু একটা কল্পনা করেই তারা তার উপাসনা করে।

তিন. তাদের একটা অংশ সমাধান খোঁজে নাস্তিকতার মাঝে। বিকৃত খ্রিষ্টধর্মকে তারা অস্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু সত্য দ্বীনের অনুসন্ধান করে না। মিথ্যা-ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় তারা মিথ্যা-ইলাহ-এর দিকেই ফিরে যায়। যে-ইলাহ হলো সে নিজেই। অর্থাৎ তার প্রবৃত্তি।

চার. পশ্চিমা-সমাজে এমন নারীও আছে যারা নিজেদেরকে পুরুষের 'ঈশ্বর' মনে করে। তারা বিশ্বাস করে, নিজেদের দেহের প্রতি পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা, পুরুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, পুরুষকে পেছনে পেছনে ঘোরানোর সক্ষমতা-এসবই তাকে পুরুষের 'প্রভু' বানিয়েছে। পুরুষ কখনো নারীর প্রতি এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এ নিয়ে অসংখ্য গানের লিরিক্স রচনা করা হয়েছে। অশ্লীল শব্দ ও ইঙ্গিত থাকায় সেসব এখানে উল্লেখ করছি না। গানগুলোর সারমর্ম অনেকটা এরকম: পুরুষ, তুমি যেহেতু আমার অঙ্গের প্রতি দুর্বল, আমার মনের সাথে বাঁধা, তাহলে তুমি আমাকে 'প্রভু' না মেনে যাবে কোথায়?

পাঁচ. নিজেকে প্রভু মেনে নেওয়ার আরেকটি লক্ষণ হলো এই-ধর্মীয় ব্যাপারে তারা পুরোপুরি উদাসীন। রবকে সন্তুষ্ট করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তাদের নেই। তাঁকে গোনায় ধরার সময় তাদের নেই। বেঁচে থাকার লক্ষ্য তাদের একটাই-চাহিদা মেটাও। প্রবৃত্তির গোলকধাঁধায় যেন তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে।

ছয়. আরেক প্রকার নারী আছে যারা চর্চা করে 'ইন্তিকায়িয়্যাহ'। তার মানে, ধর্মীয় বিধান থেকে বেছে বেছে কেবল সেই বিধানগুলোই তারা গ্রহণ করেসেবগুলো তাদের 'ইচ্ছার' সাথে খাপ খায়: প্রবৃত্তির সাথে মিলে যায়। এ উপায়ে তারা তাদের উদভ্রান্ত জীবনযাপনে এক রকমের 'আধ্যাত্মিকতার' স্বাদ পেতে চায়।

সাত, পশ্চিমা নারী-সমাজের আরেক শ্রেণি এমন-যারা ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠিত অর্থকে বিকৃত করে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করে। বিশেষত সেসব

বিধানকে যেগুলো তাদের উদভ্রান্ত চলাফেরায় লাগাম টানতে চায়; যেসব বিধান তাদের 'প্রভু-হয়ে-ওঠা'কে চ্যালেঞ্জ করে।

এই চিন্তার ভিত্তিতেই ইউরোপের দেশগুলোতে এলজিবিটি-গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ জেন্ডার বা লিঙ্গ-পরিবর্তন ও সমকামিতার মতো বিষয়গুলো তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ। পরিভাষাগুলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার এই প্রবণতা থেকেই মুসলিম-সমাজেও নারী-ইমাম, সমকামী-ইমাম দেখা যাচ্ছে। প্রচারমাধ্যমে সেগুলো ফলাও করে দেখানো হচ্ছে। মুসলিম নারীদেরকে শেখানো হচ্ছে: "ইসলাম কেবল পুরুষের একার ধর্ম না। নারীরও। সুতরাং তুমি তোমার মতো করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।" এখানে বর্ণিত প্রকারগুলোর মাঝে ধরনগত ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক একটি দিক দিয়ে তারা সবাই এক। সেটা হলো-তারা সকলেই নিজেকে 'প্রভুর আসনে' বসাতে চায়। আল্লাহ তাআলার সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর বিধানের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য-এই ধারণা পশ্চিমা-সমাজে এক অকল্পনীয় বিষয়।

মানুষের এই 'প্রভু হয়ে ওঠা' দিনশেষে মাপকাঠিগত দুটি সংকটের জন্ম দেয়। প্রথমটি হলো: প্রত্যেকে যদি নিজেই নিজের আইন তৈরি করে-যা কিনা আবার 'ভালো-লাগে-তাই' এর ভিত্তিতে-তাহলে তো খুনোখুনি বেঁধে যাবে! অন্য যে সংকটটি তৈরি করবে সেটা হলো-ভালো-মন্দের সুনির্ধারিত কোনো সংজ্ঞা থাকবে না। আর এর ফলাফল তো চোখের সামনেই! যিনা, সমকামিতা, জেন্ডার পরিবর্তনের মতো সবার কাছে নিন্দনীয় বিষয়গুলোও তাদের কাছে 'পবিত্র মানবাধিকার' হয়ে উঠেছে। 'আপনার আছে সমকামিতা খারাপ মনে হতে পারে, আমার কাছে তো না।' খেয়াল করুন! এভাবে ভাবলে জগতে ভালো-মন্দের আর কোনো বিভেদ থাকবে? দিন যত গড়াবে, গর্হিত-বিকৃত কাজগুলোও 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠবে।

পশ্চিমা নারী-সমাজ একটি অন্ধকার গর্তে আটকা পড়েছে। বিকৃত হয়ে যাওয়া ধর্মগ্রন্থগুলোয় সমাধান পায়নি বলে তারা আঁধারে পা বাড়িয়েছে। সত্য দ্বীনের অনুসন্ধান করেনি। আসমানি পয়গামে সমাধান খোঁজেনি। ফলে তারা আজ ঠিক বেঠিকের মানদণ্ড হারিয়ে ফেলেছে! এমন এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তারা বেছে নিয়েছে যা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে নতুন অনিশ্চয়তায়; ঢের বেশি পরাধীনতায়।

নবম অধ্যায়

কেমন আছে মুসলিম নারী

এবার আমরা যাব মুসলিম-সমাজের নারীদের কাছে। তাদের অবস্থাও কি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হওয়ার কথা? পশ্চিমের ফাঁদা অন্ধকার-গর্তে কি তারাও পা দেয়নি? যেমনটা বলে গিয়েছেন নবিজি। পশ্চিমকে দুনিয়াব্যাপী ছড়ি ঘোরাতে দেখে, নেতৃত্বের মগডালে বসে পা দোলাতে দেখে মুসলিম-নারী বিভ্রান্ত হয়েছে। সে পশ্চিমা নীতিনৈতিকতা, চিন্তাকাঠামো ও মাপকাঠিকে হুবহু ধারণ করেছে। ফলে ইউরোপের নারীদের মতো সে-ও নিজেকে বসাতে চেয়েছে 'প্রভুর আসনে'। পশ্চিমা নারীদের মতো মুসলিম-সমাজের নারীদেরকেও ধরন বিবেচনায় কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. মুসলিম-সমাজে এমন কিছু নারী আছে যারা আল্লাহ তাআলার-দেওয়া-শারীআতকে আন্তরিকতার সাথে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দেওয়া আইন-কানুন সে মন থেকে পছন্দ করে। সেগুলো পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

খ. কিছু বোন আছে যারা হয়তো বাহ্যিকভাবে কোনো গোনাহে জড়িয়ে আছে। তবে তারা এই গোনাহকে পাপকাজ বলেই মনে করে। গোনাহের জন্য অনুশোচনা করে। আল্লাহ তাআলার দাসত্বকে স্বীকার করে।

গ. কিছু বোন আছে-যারা আল্লাহ তাআলার শারীআতের প্রয়োজনীয়তা, এর কার্যকারিতা স্বীকার করেন। কিন্তু আল্লাহর কিছু বিধানের অপপ্রয়োগ নিয়ে আপতি তোলেন। যেমন- ক্বিওয়ামা তথা পুরুষের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার, পুরুষের একাধিক বিয়ে-কেন্দ্রিক বেইনসাফি ইত্যাদি।

ঘ. কিছু বোন আছে যারা আল্লাহর গুটিকয়েক বিধানকে মন থেকেই ত্রুটিপাই মনে করে। বেইনসাফ-স্বামী, বোন-ঠকানো ভাই কিংবা দয়ামায়াহীন বাবার প্রতি বাতপ্রাণ হয়ে তারা ইসলামের কিছু বিধানকে অপছন্দ করতে শুরু করে। তা ছাড়া মিডিয় প্রচারণা, দেশীয় আইন-কানুন, বিদ্যমান সংস্কৃতি তাদেরকে এমন চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়। এই শ্রেণির বোনদের সংশোধন করা খুবই সহজ। কেননা তারা আল্লাহর 'উবুদ্যিাহ তথা গোলামিকে অস্বীকার করে না। তারা মনে মনে চায় কেউ তাদেরকে সাহায্য করুক। তাদের মনে উঁকি দেওয়া সংশয় কেউ দূর করে দিক। (সংখ্যার দির থেকে এই শ্রেণির নারীই হয়তো বেশি হবে।)

ঙ. আর অল্প কিছু নারী আছে এমন-যারা নিজেই নিজের 'প্রভু-হয়ে-উঠেছে।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে বোনদের জন্য জরুরি হলো-আপনি ওপরে বর্ণিত শ্রেণিবিভাগটি পুনরায় পড়ুন। তারপর বোঝার চেষ্টা করুন আপনি ঠিক কোন শ্রেণিতে আছেন। আমরা এখন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি নিজের অবস্থান তখন আরও ভালোভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। এই আলোচনা বোনদের বিরোধিতা করার জন্য না। কষ্ট দেওয়ার জন্যও না। বরং তাদের সংশোধনের জন্য, উপকারের জন্য।

মুসলিম-সমাজে এমন কিছু নারী আছে যারা পুরোদমে, কোনো রাখঢাক ছাড়াই পশ্চিমের অনুকরণে ব্যস্ত। এদের কারণেই মুসলিম-সমাজেও আমাদের এলজিবিটি সংস্থার উপস্থিতি দেখতে হয়। এসব নারী নিঃসংকোচে নিজেদেরকে সেক্যুলার-নারীবাদী হিসেবে পরিচয় দেয়। অথচ সেক্যুলারিজমের ভিতই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের 'প্রভুত্বের' ওপর। সেক্যুলারিজম দ্বীনকে পরিণত করে ব্যক্তিগত বিষয়ে। দ্বীনকে ব্যাপক পরিসরে চর্চা করতে বাধা দেয়। দ্বীনপালনের ক্ষেত্রে এমনভাবে সীমারেখা এঁকে দেয় যেন সেটা অতিক্রম করা মস্তবড় অপরাধ। ঠিক এই ব্যাপারটিকেই বলে 'মানুষের-প্রভু-হয়ে-ওঠা'। এই শ্রেণির বোনদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। তারা পাশ্চাত্যের দেখানো 'গুইসাপের। গর্তে' আগাগোড়া ঢুকে পড়েছে। তাদের মাঝে 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা তীব্রভাবে জেঁকে বসেছে। ফলে আমরা আপাতত তাদের নিয়ে আর আলোচনা করছি না।

আমরা কথা বলব সেসব মুসলিম বোনকে নিয়ে, যাদের মাঝে 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা এতটা প্রবলভাবে নেই। যারা 'গুইসাপের গর্তে' এখনো ঢুকে পড়েননি, তবে পশ্চিমা সংস্থা ও তাদের স্লোগানে প্রভাবিত হয়েছেন। ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিকতা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। তারা কেবল সে পথে হাঁটতে শুরু করেছে-যে পথের শেষপ্রান্ত গিয়ে থেমেছে পশ্চিমা ডাস্টবিনে। যে পথের পরিণতি ইতোমধ্যে ভোগ করছে পশ্চিমের নারী। এ পথে হাঁটতে দিলে মুসলিম নারী-সমাজের পরিণতিও একদিন তা-ই হবে।

অধিকাংশ মুসলিম বোনই মন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-কে ভালোবাসে। কিন্তু তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দেহে ভোগে। তারা এটা বিশ্বাস করতে পারছে না যে আল্লাহ তাদের ওপর ইনসাফ করছেন। তারা ইসলামকে একবাক্যে পরিত্যাগ করতে চান না। কিন্তু তাদের এই মানসিক অবস্থা ভেতরে ভেতরে তাদেরকে দ্বীন-হীন বানিয়ে দেয়। তারা হারিয়ে ফেলে উবুদিয়্যাহ তথা আল্লাহ তাআলার গোলামির ধারণা।

মিডিয়া, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংস্থাগুলো তাদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয় প্রবৃত্তির দিকে। তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে 'আমি'। 'আমি মনে করি', 'আমি চাই', 'আমার মতে'-এরকম মনগড়া মতামত দিয়ে আল্লাহর আইনকে বিচার করতে শুরু করে! আল্লাহর আদেশকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। এভাবেই তাদের মনে 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।

প্রবৃত্তির চাওয়ার সাথে আল্লাহর বিধান কখনোই খাপ খাবে না। কিন্তু তার মনে তো জেঁকে বসেছে 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা। তাই সে তখন শুরু করে সমন্বয়ের চেষ্টা। আল্লাহর বিধানকে যে কোনো উপায়ে প্রবৃত্তির অনুগামী করার চেষ্টা করে।

মুসলিম-নারী যেভাবে 'প্রভু-হয়ে-ওঠে'

মুসলিম নারীর 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনাকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি-

১. আল-ই'রায তথা উপেক্ষা,

২. আল-ই'তিরায তথা আপত্তি,

৫২। নারীর পরিচয়। নানান চোখে, নানান আয়নায়

৩. আত-তা'বীল তথা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং

৪. আল-ইস্তিকায়িয়্যাহ তথা বেছে বেছে বিধান গ্রহণ করা।

১. আল-ই'রায তথা উপেক্ষা বা উদাসীনতা:

অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানাশোনা ও ইলম অর্জন করার ব্যাপারে সে আহত হারিয়ে ফেলে। নানান অজুহাতে এসব উপেক্ষা করে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ۞

"আমি জিন এবং মানবজাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমার ইবাদাত করবে।"পা

উবুদিয়্যাহর ধারণা অনেক ব্যাপক। ব্যাপকতার সীমাটা কেমন? তা হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে নত হওয়া। আর সে জন্য দরকার শারীআত সম্পর্কে আন্তরিক জ্ঞান। শারীআত সম্পর্কে বোঝাপড়া না থাকার কারবা ব্যক্তি তার বিবেক ও নফসকে সিদ্ধান্তদাতা বানিয়ে নেয়। তার কাছে তখন আল্লাহর গোলামির কোনো গুরুত্ব থাকে না। এরপর যখন কোনো আলিমের কাছ থেকে ডিজ কিছু শোনো। এমন কোনো বিধানের কথা শোনে যেটা তার 'ইচ্ছের' সাথে যায় নাই তখন সে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ওই আলিমকে সে বলে-কট্টরপন্থী।

অন্যদিকে সে দ্বীন থেকে নিজেকে পুরোপুরি আলাদাও করে না। সে এই কথা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়-আমি এই দ্বীনকে ঘৃণা করি না। বরং উগ্রবাদী ওসব আলিমকে ঘৃণা করি। যে বিধানগুলো তার চলমান সুখ-সুবিধায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, সে সেই বিধানকে 'ব্যাখ্যাসাপেক্ষ' বানিয়ে দেয়। হতে পারে আল্লাহ এভরদে বুঝাননি। অমুক আলিমই বরং ভুল বুঝেছে। এটা তার কট্টর চিন্তার ফসল। ইসলাম এতো কঠিন নয়। হিজাব কেন ফরজ হতে যাবে? ফ্রি-মিক্সিং কেন হারাম হতে যাবে? এটা তো ইসলামের 'সহজবোধের' সাথে যায় না। ইত্যাদি।

এভাবে সে মূলত সত্য থেকে পালাতে চায়। তার ভাবনার মূলে থাকে- 'আমি কী চাই'। 'আমার রব কী চান'-এই প্রশ্ন সে করে না। ফলে দ্বীনের ব্যাপারে তার

[৭৭] সূরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬।

মন্তব্যগুলোও এমনই- 'আমি আলিম নই। দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞও নই। তবে এই হুজুররা যেভাবে বলছে ইসলাম যে আসলে তেমন হতে পারে না, সেটা আমি জানি'।

মুসলিম-সমাজে এরকম বোনদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির চকচকে খোলস দেখে তারা গর্ববোধ করছে। তাদের এই গর্ববোধের বিপরীতে কেউ যখন সদুপদেশ দেয়- 'এমনটা কোরো না'। কিংবা বলে- 'এটা করা হারাম'। তখন সে খেপে গিয়ে বিদ্রূপ করা শুরু করে। তাকে চরমপন্থী, গোঁড়া, মৌলবাদী বলে গালি দেয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম-সমাজে এই চিত্র এখন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম নারীর 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' পেছনে এটাই প্রথম ধাপ।

এই ধাপে সে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান অর্জন না করেই অজুহাত আর ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। একদিকে দ্বীনকে সে পুরোপুরি নাকচও করতে পারে না, আবার প্রবৃত্তিপূজাও সে ছাড়তে চায় না।

২. আল-ই'তিরায তথা আপত্তি:

মুসলিম নারীর 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' দ্বিতীয় ধাপ হলো আপত্তি। পর্যায়ে এসে দ্বীনের বিধানগুলো নিয়ে সে আপত্তি তুলতে শুরু করে। পুরুষ এটা পারলে নারী কেন পারবে না? পুরুষ একাকী বাইরে ঘুরতে পারলে নারীর বেলায় বাধা কেন? পুরুষ চাকরি করতে পারলে নারী কেন পারবে না?- এমন বিভিন্ন আপত্তি তার পক্ষ থেকে আসতে থাকে। নিজের প্রবৃত্তির কাঠগড়ায় সে দাঁড় করায় আল্লাহর বিধানকে। আব নিজের প্রবৃত্তির-মাপকাঠিকে সে 'পবিত্র' ও 'প্রশ্নের উর্ধ্বে' মনে করে।

তার মনে আগে থেকেই এই বিশ্বাস গেঁথে আছে-আল্লাহর বিধান সব ক্ষেত্রে 'সমান অধিকার' (equality) বাস্তবায়ন করবে। ফলে যখন কেউ তাকে বলে, আল্লাহ নারী-পুরুষকে সমান-অধিকার দেননি। কিন্তু দিয়েছেন ন্যায়সঙ্গত-সমতা (equity)। তখন তার মুখে রাজ্যের মেঘ জমা হয়। মুখ কালো করে সে বলে দেয়-'না না! এটা তো যুক্তির কথা না। আল্লাহ এটা করতে পারেন না।'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগ বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ো না, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

সমান-অধিকার (equality) আর ইনসাফের (equity) মাঝে ফারাকটা যে ধরতে পারে না। ফলে সে ভুল বুঝতে থাকে! আর এই ভুল বুঝকেই সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। তার এই ভুল 'মাপকাঠিকেই' সহজাত যৌক্তিক ভেবে নিচ্ছে। অথচ তার রব এমন 'মাপকাঠি' কে জাহিলিয়্যাত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তবে কি তারা জাহিলি বিধিবিধান কামনা করে? যারা মজবুত ঈমানের অধিকারী, তাদের জন্য আল্লাহর বিচারের চেয়ে উত্তম বিচার আর কার হতে পারে?

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো-কেন সে এমনটা করছে? নিজের ওই 'মাপকাঠি ওয় পবিত্র মনে করছে? আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কেন সে নিজের 'বুঝ' আর ধ্যান ধারণাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে? কারণ, সে নিজেই তার 'প্রভু-হয়ে-উঠেছে'।

৩. আত-তা'বীল তথা অপব্যাখ্যা:

এই ধাপে এসে সে শারীআতের কথামালাকে (text) বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নিজের 'ইচ্ছামতো' ব্যাখ্যা করতে থাকে। যেন ওহি, ওহির বুঝ-এগুলো চূড়ান্ত, মীমাংসিত কোনো বিষয় নয়। চাইলেই যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যাখ্যা করা যায়। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অনুমান করে নেওয়া যায়। একদিকে সে প্রবৃত্তির গোলামিও করছে, আবার সেটাকে পাপও মনে করছে না। চিন্তা করুন তার অবস্থা! পাপের স্বীকারোক্তি দিয়ে যদি সে আল্লাহর উবুদিয়্যাত (গোলামি) পুরোপুরি মেনে নেয়, তাতে আশা করা

যায় সে রবের অনুগ্রহের ছোঁয়া পাবে। অন্তর্ভুক্ত হবে সেই দলে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন-

وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأُخَرَ سَيِّئًا عَلَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ

২৮] সুধা অজুরাত, ৪৯/১১

সূরা মায়িদা,

মানব-ধর্মে বাধ্য জন।

(عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم

"আর আরেকদল নিজেদের গুনাহের কথা স্বীকার করেছে; তারা কিছু ভালো কাজ করেছে, সঙ্গে কিছু খারাপ কাজও; আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করতে পারেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। "১৮০।

প্রাচ্যবিদ-মুসলিম, পশ্চিমা-মডার্নিস্ট-মুসলিম, নারীবাদী -মুসলিম-স্কলার-যারা ইজতিহাদ, ইসলামের নতুন পাঠ, ইসলামের আধুনিক পাঠের নামে আল্লাহ তাআলার পয়গামকে বিকৃত করে, শারীআতের সামগ্রিকতাকে নষ্ট করে-তাদের তাল-লয়ে সুর মেলানোর আগে একটিবারের জন্যও কি আমরা ভেবে দেখতে পারি না, তাদের উদ্দেশ্যটা কী? তারা মুসলিমদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? একটি সহজ প্রশ্ন-তাদের এই প্রকল্প কি মুসলিমদের আল্লাহর গোলামিতে উৎসাহিত করছে, নাকি তাঁর বিধান থেকে পালানোর সুযোগ করে দিচ্ছে?

মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, স্কলার ইত্যাদি নাম ব্যবহার করে তারা আল্লাহর শারীআতকে ছেড়ে-দেওয়ার-সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রভুর বিধানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই 'প্রভু-হয়ে-উঠছে'। উপরন্তু, এমন কাজকে অন্যায় মনে করা তো দূরের কথা, মুসলিমদের 'উন্নতির উপায়' হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আর কী হতে পারে?

৪. আল-ইন্তিকায়িয়্যাহ তথা বেছে বেছে বিধান গ্রহণ করা:

এটা হলো শারীআতের বিধান থেকে বেছেবেছে কিছু বিধান নিয়ে আরামদায়ক ফিকহ রচনা করার পর্যায়। শারীআতের যে বিধানটা মনের মতো হবে, পালন করতে আরাম লাগবে, সেটাকে সে মেনে নেবে। আর যেটা পালন করতে প্রবৃত্তি সায় দিচ্ছে না, আরামে একটু ব্যাঘাত ঘটছে, সেটাকে সে বাদ দিয়ে দেবে; ছাঁটাই করে ফেলবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ এদেরকে চিনিয়ে দিচ্ছেন এভাবে-

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنَ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَن قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ تحيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُون(◌َ

[৮০] সূরা তাওবা, ৯। ১০২।

"আর (রাসুল) তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন-এ উদ্দেশ্যে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের ডাকা হয়, তখন তাদের একটি দল আচমকা মুখ ফিরিয়ে নেয়; আর সত্য তাদের অনুকূলে থাকলে, তারা তাঁর কাছে সানন্দে চলে আসে! তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, নাকি তারা সন্দেহে ভুগছে, নাকি তাদের ভয় হয়-আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের ওপর অন্যায় করবেন? না, বরং আসল কারণ হলো-তারা নিজেরাই অন্যায়ে লিপ্ত।"[৮১]

অন্তরের রোগ কী? অন্তরের রোগ হলো নফসের সাথে গোলামির-সম্পর্ক তৈরি হওয়া। আল্লাহর অসীম-জ্ঞান ও ইনসাফের ব্যাপারে সন্দেহ করা। এমনটা ভাবা 'আল্লাহ অমুক বিধানের ক্ষেত্রে ইনসাফ করেননি।' (!)

পরের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن(◌َ

"(রাসূল) তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন-এ উদ্দেশ্যে যখন আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের দিকে তাদের ডাকা হয়, , তখন (প্রকৃত) মুমিনদের কথা একটাই; তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম'; আর তারাই মূলত সফল। "

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পেছনে যে ঘটনা, তাতে মুমিনদের জন্য শেখার খোরাক আছে। ঘটনাটি চমৎকার! নবিজির সাহাবি জুলাইবিব। হতদরিদ্র মানুষ। দেখতেও অসুন্দর। নবিজি তার ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন কোনো এক পাত্রীর পরিবারে। কিন্তু বাধ সাধল মেয়েটির বাবা-মা। জুলাইবিব! জুলাইবিবের জন্য আমাদের মেয়ে! কখনোই না। তখন মেয়েটি কী বলেছিল জানেন? সে বলেছিল, "আপনারা কি আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন? তাঁর ইচ্ছার সামনে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন?" এই কথা বলে মেয়েটি বিয়েতে সম্মতি দেয়। মুসলিম নারীদের অবস্থা তো এমনই হওয়া চাই।

মুসলিমদের মাঝে ইস্তিকায়িয়্যাহ চর্চার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো হিউম্যানিজম তথা মানবতাবাদ। মানবতাবাদের মূল স্লোগান- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার

[৮১] সূরা নূর, ২৪: ৪৮-৫০)

[৮২] সূরা নূর, ২৪: ৫১।

তার মানে, ব্যক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে 'মানুষ'। মুমিন কি কাফির, নেককার কি গোনাহগার-সেসব দেখার সময় নেই। সম্পর্ক, আচরণ, চিন্তাভাবনা- সবকিছুতেই দ্বীনের সীমারেখা ভুলে গিয়ে 'মানব-পরিচয়'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আল্লাহর দেওয়া ইনসাফের ধারণার চেয়ে মানুষের বানানো অধিকারের-ধারণাকে (মানবাধিকার) উঁচু মনে করা হয়। মানুষের 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক একটি উদাহরণ হলো এই মানবতাবাদ।

শঙ্কার বিষয় হলো, মানবাধিকারের এই ধারণাকে মুসলিমদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন এটা ইসলামের সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক না। 'ইসলামও তো মানুষের অধিকারের কথা বলে'-এমনটা বলে ফাঁদ তৈরি করা হয়। এমনকি নির্বাচিত কিছু আয়াত-হাদীস কোনোপ্রকার প্রসঙ্গ ছাড়াই দলিল হিসেবে ব্যবহার করে বলা হচ্ছে- হিউম্যানিজম আর ইসলামের মাঝে সবিশেষ কোনো ফারাক নেই!

মুসলিম-নারীর 'নিজেই-নিজের-প্রভু-হয়ে-ওঠা'র চারটি ধারাবাহিক পর্যায় নিয়ে এতক্ষণ যেসব আলাপ হলো, সে-সবের গোড়ায় একটাই সমস্যা। সেটা হলো-সঠিক 'মাপকাঠি' পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আর এটা করতে গিয়ে সে কেবল একটি পরিণতিই ভোগ করে-ওহির রশি তার হাত ফসকে যায়। তখনই শয়তান তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলাও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين.

"যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে ঢোকো, আর শয়তানের পায়ের ছাপ অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৮৩]

এখন মুসলিম বোনদের কাছে আমার প্রশ্ন-ইউরোপের নারীরা নাহয় ভুল পথে হেঁটে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কিন্তু আপনিও কেন সেই একই পথে হাঁটতে যাবেন? ওদের তৈরি 'মাপকাঠি'কে আপনার করে নেবেন কেন? আপনার দ্বীন তো আপনাকে বিশুদ্ধ এক মাপকাঠির সন্ধান দিয়েছে। ওদের ধর্ম যখন বলছে প্রভু মানুষকে জ্ঞানহীন, মুখ করে রাখতে চায়, আপনার দ্বীন তখন বলছে-

[৮৩] সূরা বাকারা, ২: ২০৮।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"তিনি আদমকে সব (কিছুর) নাম শেখালেন।"

ওদের ধর্ম বলছে-প্রভু অপরিপূর্ণ, দুর্বল ও মানুষের মতো। অথচ আপনার দীন আপনাকে ডাকছে পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম গুণাবলি দিয়ে গুণান্বিত এক রবের দিকে। তিনি সর্বশক্তিমান। মানুষের সাথে তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই।

ওদের ধর্ম বলছে-প্রভু নারী-বিদ্বেষী। তাই মা-হওয়া ও পুরুষের অধীন করে দিয়ে তিনি নারীকে শাস্তি দিচ্ছেন। অথচ আপনার দ্বীন এই বিষয়গুলোকেই দেখাচ্ছে নারীর মর্যাদার সিঁড়ি হিসেবে; তার উত্তম প্রতিদান লাভের কারণ হিসেবে। এসবের কারণেই সন্তানেরকাছে আপনার এতো মর্যাদা!

হে বোন, নিজেকে প্রশ্ন করুন! আপনি কি পশ্চিমের দেখানো গর্তে পা দিয়ে প্রতারিত হবেন, না আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করে সম্মানিত হবেন? আল্লাহ তাআলা কত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন আপনাকে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا(

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা দিলে, মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর কোনো অধিকার নেই যে-তাদের বিষয়ে তারা কোনো এখতিয়ার প্রয়োগ করবে; যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে ইতোমধ্যে স্পষ্ট ভুল পথে হারিয়ে গিয়েছে। "[৮]

নাকি আপনার সব মনোযোগ কেবল নিজের খেয়ালখুশি বা প্রবৃত্তিকে ঘিরে?

নিজেকে প্রশ্ন করুন! আপনার কাজেকর্মে কি আল্লাহর প্রতি গোলামির ভাব ফুটে উঠছে? তাঁর প্রতি নতি স্বীকারের পরিপূর্ণ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে? যেমনটা তিনি তার রাসূল-কে বলেছেন-

[৮৪] সূরা বাকারা, ২: ৩১।

[৮৫] সূরা শূরা, ৪২: ১১।

[৮৬] সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৬।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* َ

"(হে নবি) বলো, 'আমার নামাজ, আমার সামগ্রিক আনুগত্য, আমার জীবন, আমার মরণ-সবই মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য।'"[ল্য

নিজের সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিয়ে আপনি কি আল্লাহর গোলামি ও শারীআতের নিঃশর্ত আনুগত্যের স্বীকৃতি দিচ্ছেন? নাকি আপনি ইসলামের কেবল সেই অংশটুকুই মেনে নিচ্ছেন যেটুকু (খণ্ডিত-ইসলাম) আপনার প্রবৃত্তির মাপকাঠিতে উতরে গেছে?

'প্রভু-হয়ে-উঠতে-চাওয়া মুসলিম নারী'-এটি একটি স্ববিরোধী কথা। কেননা মুসলিম শব্দের অর্থই-আল্লাহর-বিধানের-সামনে-আত্মসমর্পণ-করা ব্যক্তি। যে আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে, সে আবার 'প্রভু-হয়ে-উঠতে' চায় কী করে? মুসলিমের কাজ তো বরং প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা, আর 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনাকে কঠোরভাবে দমন করা।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى*

"আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং খারাপ প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, জান্নাত-ই হবে (তার) ঠিকানা।"।

সবশেষে বলব, 'প্রভু-হয়ে-উঠার' বাসনা নারীকে কী দিয়েছে? সম্মান? মর্যাদা? নিপীড়ন হতে মুক্তি? কোনোটাই না। আপনি যাদের দেখে আশায় বুক বাঁধছেন, তারা তো 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' চেষ্টায় আপনার চেয়ে এগিয়ে। এতেও কি তাদের মুক্তি মিলেছে? ইউরোপের সেই 'স্বাধীন', 'প্রগতিশীল', 'সমতা-পাওয়া' নারীরা কি সত্যিকারের সম্মান, শান্তি ও ইনসাফ পেয়েছে?

কখনোই নয়। আমরা বরং উল্টোটা দেখেছি। দেখেছি, 'প্রভু-হয়ে-ওঠার' বাসনা কীভাবে তাদের ঠেলে দিয়েছে ঘোর অমানিশায়। ঠিক এই কথাটিই তো আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বহু আগে!-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْنى.

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ,

[৮৭] সূরা আনআম, ৬: ১৬২।

[৮৮] সূরা নাযিআত, ৭৯: ৪০-৫১।

আর কিয়ামাতের দিন তাকে ওঠাব অন্ধ করে। "[৮৯]

সুতরাং, নারী-পুরুষ যে-ই হোক-আল্লাহর গোলামি থেকে সরে গিয়ে প্রবৃত্তির গোলামি শুরু করলে তার ওপর বহুগুণ নিপীড়ন চেপে বসবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র-রবের গোলামি ছেড়ে দিলে সবার বেলাতেই একই পরিণাম অবধারিত। মহান আল্লাহও সে কথাই বলেছেন-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. ۩

“তুমি কি দেখোনি-মহাকাশের বাসিন্দারা, দুনিয়ার অধিবাসীরা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়পর্বত, গাছপালা, জীবজন্তু ও বহুসংখ্যক মানুষ আল্লাহর (নির্দেশের) সামনে নত

হয়ে আছে? অবশ্য অনেকের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে; আল্লাহ যাকে অপদস্থ করবেন, তাকে সম্মান দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই, আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। "[১০]

পাশ্চাত্য নারীসমাজ আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে। পরিণতিতে বরণ করে নিয়েছে 'পুরুষের দাসত্ব'। আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দেবেন তো তিনি আপনাকে মানুষের দাস বানিয়ে রাখবেন।

আমাদের এই কথাগুলো বোনদের বিরুদ্ধে নয় কখনোই। বরং এ কথাগুলো তাদের কল্যাণের জন্যই বলা। হে বোন, আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনারা আসল সত্য জানুন, আসল রবকে জানুন-এ-ই আমাদের চাওয়া। আমরা যেন কখনোই ওহির মাপকাঠি থেকে সটকে না পড়ি। আল্লাহর রশি যেন আমাদের হাত-ফসকে না যায়। জগতের সব সমস্যার সমাধান আছে রবের গোলামিতে। সম্মান পাবেন কার কাছে? উত্তর দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি সম্মান ও ক্ষমতা চায়, সে যেন মনে রাখে-সম্মান ও ক্ষমতা।

[৮৯] সূরা ত্ব-হা, ২০: ১২৪।

[১০] সূরা হাজ্জ, ২২: ১৮।

পুরোটাই আল্লাহর মালিকানাধীন। "[১১]

আল্লাহর দেওয়া বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও সম্মান কিংবা মুক্তি খুঁজে বেড়ানো মানে-নিপীড়নের রাস্তায় পা বাড়ানো। আমরা বলছি না-আপনার ওপর-হওয়া অবিচারগুলো মুখবুজে সহ্য করে যাবেন। তবে আমরা এটাও বলছি না-সেসব জুলুম-নিপীড়নের সমাধান খুঁজতে আপনি পশ্চিমা আবর্জনা হাতড়ে বেড়ান। আমরা কেবল বলছি, ইসলামই পারে আপনার হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিতে; লুট-হয়ে-যাওয়া সম্মান কেড়ে এনে দিতে। হ্যাঁ, ইসলামই আপনার মুক্তির একমাত্র উপায়।

১১] সূরা ফাতির, ৩৫: ১০।

উপসংহার

সারসংক্ষেপ: এবারে আমি নারী সংক্রান্ত আলোচনায় এ যাবত যে মতামত ব্যক্ত করেছি, তার সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা প্রয়োজন মনে করছি:

১. নারীকে শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য। তবে তার পাঠ্যসূচী পুরুষের থেকে কিছুটা পৃথক হওয়া চাই, যাতে সে ভবিষ্যতের একজন দক্ষ গৃহিনী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

২. ইসলামের দেয়া যাবতীয় অধিকার তাকে অবশ্যই দিতে হবে। এ বিষয়ে আমি শুরুতেই বিশদভাবে আলোচনা করছি।

৩. দুর্যোগ ও যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির সংকটকালের জন্য তাকে প্রস্তুত করায় মনোযোগী হতে হবে। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হ'য়ে থাকি। তাই নারীকে বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও পারিবারিক ত্রাণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ দিতেই হবে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, অস্ত্র ব্যবহার ও নিক্ষেপ ইত্যাদির কাজে পারদর্শী হতে হবে। তবে এ সব কিছুই ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকেই অর্জন করতে হবে।

৪. সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে তার কর্মসীমা এমনভাবে নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দিতে হবে, যাতে কেবল তার স্বভাব ও মূল পারিবারিক দায়িত্বের সাথে মানানসই কোন চাকুরিতেই নিয়োগ করা হয়। যেমন মহিলা ও শিশুর চিকিৎসা, শিশু ও বালিকাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বা অনুরূপ সামাজিক ও পারিবারিক সেবা সংক্রান্ত কোন কাজ।

৫. নারীকে তার পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালন পালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে।

৬. নিষিদ্ধ বেগানা পুরুষদের সাথে ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে যতটুকু একেবারেই অনিবার্য হিসেবে অনুমোদিত, তার অতিরিক্ত কোন মেলামেশা করতে দেয়া যাবে না। মসজিদে নামায পড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া করা হচ্ছে অনুমোদিত ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

৭. সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের মাধ্যমে নারীর সুখ শান্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এবং দলীয় মতভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সে সমাজ ও পরিবারের সেবার মূল দায়িত্ব যাতে পালন করতে পারে, সে জন্য নারীকে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান থেকে বিরত রাখা কর্তব্য।

৮. প্রত্যেক নারীকে নারী সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংসারের কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, আমাদের মায়েদেরকে ও নারীদেরকে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরী। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।

৯. নারীর আহার বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব বহনে সক্ষম স্বামী, পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয় বিদ্যমান নেই, এমন নিরুপায় পরিস্থিতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই তাকে বাড়ীর বাইরে গিয়ে চাকুরী করতে দেয়া যাবেনা। একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সরকারী কোষাগার থেকে এ ধরনের উপায়হীন ও অসহায়া নারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ ধরনের নারীরা বাড়ীর বাইরে, সাময়িকভারে জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

১০. নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী এবং দেহ ও সাজসজ্জার যতটা আল্লাহর আইনে নিষিদ্ধ, ততটা প্রকাশ করাকে যে কোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন জারী করতে হবে। আর সদুপদেশের মাধ্যমে যে সব নারী নিজের সৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শনী করে পুরুষদের চরিত্র ধ্বংসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছুক নয় তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে এ শাস্তি কতটা কঠোর হবে তা নির্ভর করবে অপরাধিনীর মানসিকতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর।

১১. অশ্লীল যৌন সাহিত্যের এই বিপজ্জনক ছড়াছড়ি যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা জরুরী। এ কাজে জনগণকে সাহায্য করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মতে, এ জাতীয় সাহিত্যের প্রকাশনা বন্ধ করার দায়দায়িত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা আমাদের নারী সমাজের ঘাড়েই অর্পিত। তাদেরকে এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিন্দা ও ধিক্কার দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ কথা

সর্বশেষে আমি যে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া না করেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের মুসলিম জনগণ কোন অবস্থায়ই ইসলামের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে এবং তার আইনকানুন ও বিধিবিধান লংঘন করতে প্রস্তুত নয়। ইসলামের বিধান ও দর্শন যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত, যুক্তিসংগত, নির্ভুল ও অকাট্য সে ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা সংশয় নেই। নারীদের বিষয়ে

ইসলামে যা কিছু আছে, তার বিরুদ্ধে যে দিক থেকে যে চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন, মুসলিম আলেমগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ চিরদিন তার মুকাবিলা করে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের ঈমানদার মা বোন ও কন্যারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবেনা। ইসলামী বিধানের বিরোধিতা যারাই করুক, তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সহ সর্বাত্মক প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

এ দায়িত্বটা যদি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি, তা হলে আমাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও তৎপরতা চলতে থাকার জন্য আমরা দায়ী হবনা। আমরা যে এ প্রচারণা ও তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য, এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার

জন্য এবং সমাজে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, সেটাই আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। আমাদের চেষ্টা সাধনার পরও যদি সাফল্য না আসে, ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড স্তিমিত না হয়, এবং তা আমাদের সমাজ ও নব প্রজন্মের ধ্বংস ও ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকে, তাহলেও ইতিহাসের কাঠগড়ায় আমরা অভিযুক্ত হওয়া থেকে অব্যাহতি পাব। আর আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীর প্রশ্নে আমাদের ক্ষেত্রে আল কুরআনের এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবে "তাদের (বনী ইসরাইলের) একটি গোষ্ঠী যখন সংস্কার কার্মীদেরকে বললো যে, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর, তাদেরকে তোমরা কেন সদুপদেশ দিচ্ছ! তখন তারা বললো, আল্লাহর কাছে জবাবদিহী এড়ানোর জন্য এবং ওরা নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করবে এই আশায় উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি।"

বস্তুত আমাদের দায়িত্ব পালন, সতর্কীকরণ এবং এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে কোন্টা সত্য ও কোন্টা মিথ্যা, তা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে আমরা যে কোন কসুর করিনি, এটাই আমাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

আমাদের জনগণ যদি উপলব্ধি করে যে, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ও নীতিগত প্রভাব প্রতিপত্তির আওতাধীন থাকার কারণে আমাদের পক্ষে এই ইসলামবিরোধী তৎপরতার চতুর্মুখী অভিযান বন্ধ করা সম্ভব নয়, তাহলেও হতাশ ও হতোদ্যম হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এ কথা এখন কারো জানতে বাকী নেই যে, আমরা যে মহাসত্যের দিকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়ে আসছি, তার প্রতিষ্ঠায় অংগীকারাবদ্ধ ঈমানদার যুবক যুবতীদের এক বিশাল বাহিনী ইতিমধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। তারা ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়াতে দুর্জয় সংকল্পে উজ্জীবিত হ'য়ে জোর কদমে এগিয়ে

চলেছে। আল্লাহর দীনের পথে সংগ্রামে তারা কোন বাধাবিপত্তি ও কোন রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটিকে যেমন ভয় পায়না, তেমনি সন্দেহ সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিন্দা কুৎসা ও অপপ্রচারে সংকুচিত ব্যক্তিদের পিছুটানেও পিছপা হয়না। ঈমানের দুর্জয় শপথে বলীয়ান এই বাহিনীর সিপাহীরা আরব অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের সংঘাতের সূচনাকাল থেকেই সত্যের যে বাহিনী মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করে এসেছে, বর্তমানের এ বাহিনী তাদেরই উত্তরসূরী। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সত্যের এ বীর সেনানীরা এগিয়েই যেতে থাকবে এবং মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে থাকবে: 'হে আমাদের রব, একজন আহ্বায়ক আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহ মাফ কর, আমাদের অন্যায় কাজগুলোর কাফফারার ব্যবস্থা কর, এবং আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে মৃত্যু দাও।' (সূরা আলে ইমরান)